হিন্দুধর্ম শিক্ষা

পঞ্চম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

হিন্দুধর্ম শিক্ষা

পঞ্চম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

প্রথম মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০২৫

রচনা, সংকলন ও সম্পাদনা

প্রফেসর ড. নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস

পবিত্র কুমার হীরা

সঞ্জয় কুমার রত্ন

জগজ্জীবন বিশ্বাস

প্রত্যুষা বর্মন

মোঃ মনির হোসেন মজুমদার

শিল্প নির্দেশনায়

হাশেম খান

ছবি, অলংকরণ ও গ্রাফিক ডিজাইন

সজীব সেন

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণের জন্য জাতিসত্তা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শারীরিক-মানসিক সীমাবদ্ধতা এবং ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের সকল শিশুর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদানভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা এবং বিদ্যালয়ে আনন্দময় অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা করা। ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের সাথে সংগতি রেখে প্রাথমিক স্তরের পরিসর বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করার উপর জোর প্রদান করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) একটি সমন্বিত শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেছে। এই শিক্ষাক্রমে একদিকে শিক্ষাবিজ্ঞান অনুসরণ করা হয়েছে ও উন্নত বিশ্বের শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের চিরায়ত শিখন-শেখানো মূল্যবোধকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাকে অধিকতর জীবনমুখী ও ফলপ্রসূ করার প্রয়াস বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে। বিশ্বায়নের বাস্তবতায় শিশুদের মনোজাগতিক অবস্থাকেও শিক্ষাক্রমে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। অংশীজনদের চাহিদা এবং মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সর্বশেষ ২০২৫ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ (প্রাথমিক স্তর) এর প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ প্রাথমিক স্তর (পরিমার্জিত ২০২৫) এর আলোকে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকসমূহ ইতোমধ্যে পরিমার্জন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ প্রাথমিক স্তর (পরিমার্জিত ২০২৫) এর আলোকে চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক। এই বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে এনসিটিবি প্রাথমিক স্তরসহ প্রতিটি স্তর ও শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। প্রতিটি পাঠ্যপুস্তক রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিশুমনের বিচিত্র কৌতূহল এবং ধারণক্ষমতা সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে । শিখন-শেখানো কার্যক্রম যাতে একমুখী ও ক্লান্তিকর না হয়ে আনন্দের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে সেদিকটি শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, প্রতিটি পাঠ্যপুস্তক শিশুদের সুষম মনোদৈহিক বিকাশে সহায়ক হবে। একই সাথে তাদের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা, অভিযোজন সক্ষমতা, দেশপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের পথকেও সুগম করবে।

পঞ্চম শ্রেণির 'হিন্দুধর্ম শিক্ষা' পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের সময়ে পূর্ব-শ্রেণির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণিতে সাধারণত ১০ বছরের অধিক বয়সের শিশুরা পাঠ গ্রহণ করে। বয়সের কথা বিবেচনায় রেখে শিক্ষাক্রম অনুসারে পাঠ্যপুস্তকে শিখন বিষয়ের উল্লম্ব ও আনুভূমিক বিন্যাস ঘটানো হয়েছে। প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আবশ্যকীয় জ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধ অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণে যেন সক্ষম হয়, সে চেষ্টা করা হয়েছে। পাঁচটি শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকেই তথ্য ও বর্ণনামূলক রচনাগুলোর ধারাবাহিকতা রয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন, চূড়ান্তকরণ এবং সমন্বয় কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণিশিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, চিত্রশিল্পী এবং ইনডিজাইনারসহ যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। পাঠ্যপুস্তকটি ত্রুটিমুক্তকরণে সংশ্লিষ্ট সকলের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

সেপ্টেম্বর ২০২৫

প্রফেসর রবিউল কবীর চৌধুরী
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড,
বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	**সৃষ্টিকর্তা ও হিন্দুধর্মের স্বরূপ**	
প্রথম পরিচ্ছেদ	হিন্দুধর্ম, সৃষ্টিকর্তা ও ঈশ্বরের স্বরূপ	১-৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	জন্মান্তর ও কর্মফল	৬-৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	হিন্দুধর্মের অনুশাসন	১০-১৪
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	স্তব-স্তোত্র ও প্রার্থনা	১৫-২০
দ্বিতীয় অধ্যায়	**অবতার ও আর্দশ জীবনচরিত**	
প্রথম পরিচ্ছেদ	অবতার	২১-২৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	আর্দশ জীবনচরিত	২৮-৪০
তৃতীয় অধ্যায়	**নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি**	
প্রথম পরিচ্ছেদ	সহমর্মিতা	৪১-৪৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ	৪৭-৫১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	সদাচার	৫২-৫৫
চতুর্থ অধ্যায়	**ধর্মগ্রন্থ, দেব-দেবী ও পূজা, মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র**	
প্রথম পরিচ্ছেদ	হিন্দুধর্মগ্রন্থ	৫৬-৬২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	দেব-দেবী ও পূজা	৬৩-৬৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র	৭০-৮১
পঞ্চম অধ্যায়	**জীবসেবা ও দেশপ্রেম**	
প্রথম পরিচ্ছেদ	মানুষ, প্রকৃতি ও ঈশ্বর	৮২-৮৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	জীবসেবা	৮৮-৯১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	দেশপ্রেম	৯২-৯৬

প্রথম অধ্যায়

সৃষ্টিকর্তা ও হিন্দুধর্মের স্বরূপ

প্রথম পরিচ্ছেদ

হিন্দুধর্ম, সৃষ্টিকর্তা ও ঈশ্বরের স্বরূপ

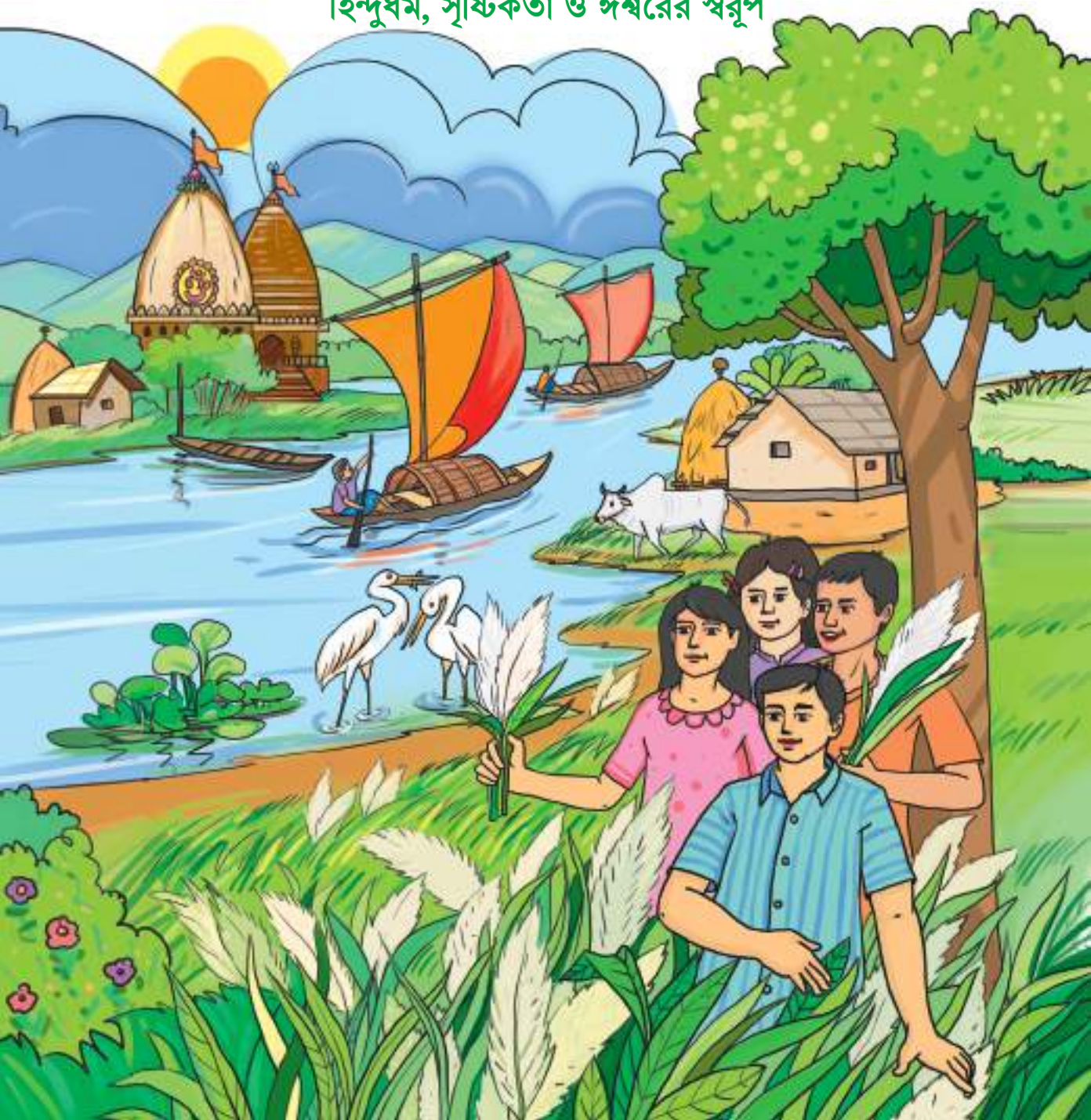

ছবিটিতে তোমরা প্রকৃতির কী কী উপাদান দেখতে পেয়েছ, সেগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করো:

... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...

প্রকৃতি কে সৃষ্টি করেছেন? তাঁর সম্পর্কে তোমার ভাবনা কী, তা পাঁচটি বাক্যে লেখ:

১

২

৩

৪

৫

'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর।' এই সত্যসুন্দর কে? তাঁকে আমাদের জানতে হবে। বুঝতে হবে। সত্যসুন্দর হলেন স্রষ্টা বা সৃষ্টিকর্তা। স্রষ্টার কথা আগের শ্রেণিতেও আমরা পড়েছি। তাঁকে জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করেছি; কিন্তু ঈশ্বরের কথা কি বলে শেষ করা যায়? আমরা চারদিকে তাকাই। বিস্মিত হই! কতো যে রূপ, কতো বৈচিত্র্য! নানা নামের বৃক্ষ-লতা-পাতা। নানা রকম পশু-পাখি। নানা রঙের প্রজাপতি। প্রজাপতি দেখলেই আনন্দ হয়। মনে হয়

ওর পেছন পেছন দৌড়াই। আর ফুল-কতো যে রঙ, কতো যে গন্ধ! চোখ ফেরানো যায় না। আবার নদী-নালা-খাল-বিল-সাগর! এদের রূপ ও বিশালতায় আমরা মুগ্ধ হই। অবাক হই! তারপর আকাশের দিকে তাকাই। ভোরবেলায় পূর্ব দিকে দেখা যায় নয়ন ভোলানো লোহিত বর্ণ। দিনের আকাশে দীপ্তিমান সূর্য। রাতের আকাশে গ্রহ-নক্ষত্র। যেন আকাশ-বাড়িতে কেউ অগণিত তারার বাতি জ্বালিয়ে রেখেছে। আমরা ঘর-বাড়ি-আসবাবপত্রের নির্মাতার নাম জানি। কিন্তু প্রকৃতি ও আকাশ এবং সেই সঙ্গে অপরূপ বৈচিত্র্যের স্রষ্টার নাম কী? তাঁর নাম জানতে ইচ্ছা হয় কি? নিশ্চয়ই হয়। মুনি-ঋষিরা তাঁর নাম দিয়েছেন ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান প্রমুখ। ঈশ্বর আমাদের দেখা-না-দেখা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্টির শেষ নেই। সবকিছুই তিনি সৃষ্টি করেছেন।

ঈশ্বরকে হিন্দুধর্মে নানা রূপে ভাবা হয়েছে। ঈশ্বর নিরাকার ও সাকার দুই-ই। তিনি এত বড়ো, এত বিরাট, এত শক্তিমান যে, কোনো আকৃতির মধ্যে তাঁকে বাধা যায় না। তাই তিনি নিরাকার। মুনি-ঋষিরা এই নিরাকার ঈশ্বরের নাম দিয়েছেন ব্রহ্ম। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তিনি ইচ্ছা করলে যে কোনো রূপ ধারণ করতে পারেন। এই বিভিন্ন রূপধারী ঈশ্বরই সাকার। মুনি-ঋষি-সাধকেরা তাঁর নানা শক্তির রূপ দিয়েছেন। যেমন: বিদ্যাশক্তির রূপ সরস্বতী, ধনশক্তির রূপ লক্ষ্মী ইত্যাদি। ঈশ্বরের সাকার রূপ দেব-দেবী। ঈশ্বর সগুণ এবং নির্গুণ। সগুণ অর্থ গুণযুক্ত। নির্গুণ অর্থ গুণাতীত। সমস্ত গুণের অতীত। কোনো নির্দিষ্ট গুণের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। সগুণ ঈশ্বর হলো দেব-দেবী। ঈশ্বরের গুণকে একেকটি রূপ দিয়ে আকার দেওয়া হয়। যেমন: যিনি শক্তিগুণযুক্ত তিনি দেবী দুর্গা। নির্গুণ ঈশ্বর ব্রহ্ম।

ঈশ্বর এক; কিন্তু দেব-দেবী অনেক। এক ঈশ্বরের বিভিন্ন শক্তি ও গুণের প্রতীক দেব-দেবী। মুনি-ঋষি এবং সাধকেরা ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপের কথা ভেবেছেন। সর্বপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদে বলা হয়েছে—"একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।" (ঋগ্বেদ, ১/১৬৪/৪৬)। অর্থাৎ সদ্ বস্তু বা পরমেশ্বর এক। বিপ্র বা জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাঁর বহু নাম দিয়েছেন। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। আমরা যখন বন বলি, তখন অনেক গাছের সমষ্টি বোঝায়। বিচ্ছিন্নভাবে; কিন্তু সেগুলো বিভিন্ন নামের গাছ। যখন জলাশয় বলি তখন জলযুক্ত স্থানের সমষ্টি বোঝায়। আবার খাল-বিল-নদ-নদী-সমুদ্র যখন বলি তখন বিভিন্ন নামের জলাশয় বোঝায়। ঈশ্বরও এক। দেব-দেবী তাঁর বিভিন্ন নাম। ঈশ্বর সত্যসুন্দর, আনন্দময় ও মঙ্গলময়।

হিন্দুধর্ম সনাতন ধর্ম নামেও পরিচিত। এই সনাতন ধর্ম বলার নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। 'সনাতন' শব্দের অর্থ চিরন্তন বা চিরকালীন, যা পূর্বে ছিল, এখন আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে তাই সনাতন। অর্থাৎ যা অপরিবর্তনীয়। আমাদের মধ্যে অনেক বিষয় আছে, যা সব সময়ই মঙ্গলদায়ক। এমন অনেক আচরণ আছে, যা সব সময়ই আমাদের চর্চা করা উচিত।

যেমন: শাস্ত্রে আছে, কেউ গৃহে এলে তাকে উঠে বসার আসন দেবে। তৃষ্ণার্তকে জল দেবে। ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেবে। সুন্দরভাবে কথা বলবে। এই যে কর্তব্য ও আচরণ এটাই সনাতন ধর্ম। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে 'সনাতন' কথাটি আছে। ভালো কথা, ভালো কাজ যুগ যুগ ধরে সনাতন ধর্ম নামে পরিচিতি পেয়েছে। হিন্দু ধর্মবিশ্বাসে এই অবিনাশী বাণী, চিরন্তন আচরণ শ্রদ্ধার সঙ্গে চর্চা করা হয়। এজন্য হিন্দুধর্মকে সনাতন ধর্ম বলা হয়। তবে হিন্দু নামটি দেশে-বিদেশে সর্বত্র বেশি ব্যবহৃত।

হিন্দুধর্ম-বিশ্বাসে একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। এই সৃষ্টিকর্তা সাকার-নিরাকার দুইভাবেই পূজিত। ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজিত। প্রকৃতি ও জীবের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত। তাই প্রকৃতি-পূজার মধ্য দিয়ে প্রকৃতিকে সংরক্ষণের গুরুত্ব দেওয়া হয়। জীবসেবার মধ্য দিয়ে জীবকে রক্ষার গুরুত্ব দেওয়া হয়। জন্মান্তর ও কর্মফলকে স্বীকার করা হয়।

ঈশ্বর মঙ্গলময়, প্রেমময়, অতি আপন—এই ভাবটি হিন্দুদের কাছে বেশি গ্রহণীয়। তাঁকে খোঁজার জন্য দূরে কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি আমাদের অন্তরেই আছেন।

অনুশীলনী

(ক) সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. আনন্দলোকে মঙ্গালালোকে ..... সত্যসুন্দর।
২. ঈশ্বর ..... ও সাকার দুই-ই।
৩. একং সদ্ বিপ্রা ..... বদন্তি।
৪. ঈশ্বর সত্যসুন্দর, আনন্দময় ও .....।
৫. হিন্দুধর্ম ..... নামেও পরিচিত।

(খ) বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

বাম	ডান
১. মুনি-ঋষিরা তাঁর নাম দিয়েছেন	ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত।
২. ঈশ্বরকে হিন্দুধর্মে	তিনি দেবী দুর্গা।
৩. ঈশ্বরের সাকার রূপ হলো	নানা রূপে ভাবা হয়েছে।
৪. যিনি শক্তিগুণযুক্ত	দেব-দেবী।
৫. প্রকৃতি ও জীবের মধ্যে	ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান প্রমুখ।
	নির্গুণ ঈশ্বর ব্রহ্ম।

(গ) সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. ভোরবেলায় পূর্বদিকে নয়ন ভোলানো কী দেখা যায়?

(ক) লোহিত বর্ণ (খ) শ্বেত বর্ণ
(গ) কৃষ্ণ বর্ণ (ঘ) পীত বর্ণ

২. 'সত্য সুন্দর' শব্দটি দিয়ে কাকে বোঝানো হয়েছে?

(ক) অবতার (খ) ঈশ্বর
(গ) প্রকৃতি (ঘ) মানুষ

৩. মুনি-ঋষিরা নিরাকার ঈশ্বরের কী নাম দিয়েছেন?

(ক) ব্রহ্ম (খ) বিষ্ণু
(গ) মহেশ্বর (ঘ) ব্রহ্মা

৪. 'সনাতন' শব্দের অর্থ কী?

(ক) ক্ষণস্থায়ী (খ) পরিবর্তনীয়
(গ) চিরন্তন (ঘ) অপরিবর্তনীয়

(ঘ) নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. সর্বপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদে ঈশ্বর সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?
২. সগুণ ঈশ্বর কাকে বলে?
৩. নির্গুণ ঈশ্বর কাকে বলে?
৪. ঈশ্বরকে খোঁজার জন্য দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই কেন?

ঙ) নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর দাও:

১. হিন্দুধর্মকে সনাতন ধর্ম বলার কারণ ব্যাখ্যা করো।
২. হিন্দুধর্মের মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আটটি বাক্য লেখ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জন্মান্তর ও কর্মফল

যে ব্যক্তি ভালো কাজ করেন, তিনি পুরস্কার পান। আবার যিনি মন্দ কাজ করেন তিনি শাস্তি পান। অর্থাৎ মানুষ কর্ম অনুসারে ফল ভোগ করে। এই কর্মফল জন্মান্তরেও ভোগ করতে হয়। তাই সর্বদা ভালো কাজ করা উচিত।

তুমি কী কী ভালো কাজ করেছ এবং কী কী পুরস্কার পেয়েছ তার একটি তালিকা তৈরি করো:

ভালো কাজ	প্রাপ্ত পুরস্কার

মানুষের জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। জন্ম হলে মৃত্যু হবেই। হিন্দুধর্ম-বিশ্বাসে বলা হয়, মৃত্যুর পর আবার জন্ম আছে। একে বলা হয় জন্মান্তর। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ অনেক কাজ করে। সবাই একই রকম কাজ করে না। নানা জন নানা রকম কাজ করে। তারপর একদিন মৃত্যু হয়। কিন্তু মৃত্যুর পরেই কি সব শেষ হয়ে যায়? মৃত্যুর পরে কি অন্য কোনো জগৎ আছে? এরূপ নানা প্রশ্ন আমাদের মনে আসে। মানুষের মধ্যে কেউ ভালো কর্ম করে, কেউ মন্দ কর্ম করে। যে ভালো কর্ম করে, মৃত্যুর পরে তার ভালো জন্ম হয়। যে মন্দ কর্ম করে, তার মন্দ জন্ম হয়। এভাবে কর্মফল অনুসারে জন্মান্তর ঘটে। আমাদের ধর্মগ্রন্থে জন্মান্তরের এরূপ অনেক কাহিনি আছে।

সাধারণত জন্মান্তরের কথা মনে থাকে না। কিন্তু অনেকের মনে থাকে। যাদের মনে থাকে তাদের জাতিস্মর বলে। মহাভারতের একটি অন্যতম চরিত্র গান্ধারী। তাঁর জন্মান্তর হয়েছিল। তিনি ছিলেন জাতিস্মর। অর্থাৎ তিনি পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ করতে পারতেন। তিনি ছিলেন শত পুত্র ও এক কন্যার জননী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁর শত পুত্রের মৃত্যু হয়। পুত্রশোকে আকুল গান্ধারী। যুদ্ধশেষে একদিন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলেন, 'দেখো, আমি আমার বহু পূর্ব জন্মের কথা

স্মরণ করতে পারি। আমার মনে পড়ে না, আমি কোনো পাপ করেছি। যে পাপের ফলে আমার শত পুত্রের মৃত্যু হতে পারে। কেন আমাকে শত পুত্রের মৃত্যুশোক সইতে হলো?' তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'আরো পূর্বের কথা আমি জানি। তুমি কোনো এক জন্মে এক শত পতঙ্গকে বিদ্ধ করেছিলে। তখন তুমি অনেক ছোটো। খেলাচ্ছলে তুমি পতঙ্গদের মেরেছিলে। তারপর তাদের বিদ্ধ করে মালা গেঁথেছিলে। সেই পাপে এ জন্মে তোমার শত পুত্রের মৃত্যু হয়েছে।' এ কাহিনি থেকে বোঝা যায়, জন্মান্তর আছে। পূর্ব জন্মের কর্মফল অনুযায়ী পুনর্জন্ম হয়। এ থেকে আমরা আরো শিক্ষা নিতে পারি, বিনা কারণে প্রাণী হত্যা করা উচিত নয়। অন্যান্য ধর্মের মতো সনাতন ধর্মেও বিনা কারণে প্রাণী হত্যা মহাপাপ বলে গণ্য করা হয়।

শাস্ত্রমতে, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আত্মা আছে। আত্মা আছে বলেই আমরা বেঁচে আছি। আত্মা চলে গেলে আমাদের দেহ পড়ে থাকে। আমাদের মৃত্যু হয়; কিন্তু আত্মা অবিনাশী। আত্মার মৃত্যু নেই। আত্মা অন্য দেহ ধারণ করে। এ সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় একটি সুন্দর শ্লোক আছে:

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।। (২/২২)

[**সন্ধিবিচ্ছেদ:** নরোঽপরাণি = নরঃ + অপরাণি; জীর্ণান্যন্যানি = জীর্ণানি + অন্যানি।]

সরলার্থ: মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, আত্মাও তেমনি জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর গ্রহণ করে।

আত্মার এক দেহ ছেড়ে অন্য দেহে যাওয়ার ব্যাপারটি ঘটে কর্মফল অনুসারে। তবে কেউ যদি ভালো কর্ম করে এবং মৃত্যুর সময় কেবল ঈশ্বরের কথা স্মরণ করে তাহলে তার আর জন্ম হয় না। তখন তার মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে।

অনুশীলনী

(ক) সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. যে ব্যক্তি ভালো কাজ করেন তিনি ..... পান।
২. জন্ম হলে ..... হবেই।
৩. পূর্ব জন্মের ..... অনুযায়ী পুনর্জন্ম হয়।
৪. বিনা কারণে ..... করা উচিত নয়।
৫. আত্মার ..... নেই।

(খ) বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

বাম	ডান
১. যিনি মন্দ কাজ করেন	অন্যতম চরিত্র গান্ধারী।
২. মানুষের জন্ম আছে,	আমরা বেঁচে আছি।
৩. মহাভারতের একটি	তিনি শাস্তি পান।
৪. আত্মা আছে বলেই	মৃত্যু আছে।
৫. তখন তার মোক্ষ	মৃত্যু নেই।
	প্রাপ্তি ঘটে।

(গ) সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. পুত্রশোকে কে আকুল হয়েছিলেন?

(ক) দ্রৌপদী (খ) গান্ধারী

(গ) কুন্তী (ঘ) মাদ্রী

২. কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে গান্ধারীর কত পুত্রের মৃত্যু হয়?

(ক) পাঁচ (খ) দশ

(গ) পঞ্চাশ (ঘ) শত

৩. খেলাচ্ছলে গান্ধারী কাদের মেরেছিলেন?

(ক) পতঙ্গদের (খ) পাখিদের

(গ) পশুদের (ঘ) পিঁপড়াদের

৪. শাস্ত্রমতে, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে কী আছে?

(ক) মন (খ) বুদ্ধি

(গ) পরমাত্মা (ঘ) আত্মা

(ঘ) নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. জন্মান্তর কাকে বলে?

২. পুত্রশোকে আকুল গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণকে কী বলেছিলেন?

৩. কেন গান্ধারীর শতপুত্রের মৃত্যু হয়েছিল?

৪. আত্মার বৈশিষ্ট্য লেখ।

ঙ) নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর দাও:

১. "কর্মফল অনুসারে জন্মান্তর ঘটে"—কথাটি ব্যাখ্যা করো।

২. গান্ধারী এবং শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই—তা নিজের ভাষায় লেখ।

৩. আত্মা সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় বর্ণিত শ্লোক সরলার্থসহ লেখ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হিন্দুধর্মের অনুশাসন

উপরের ছবিটি দেখো এবং তুমি কীভাবে সকলকে সম্মান করো তা নিচের ছকে লেখ:

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

প্রত্যেক ধর্মেরই কিছু নিয়মনীতি আছে। এই নিয়মনীতি মানতে হয়। অন্যথায় ধর্মের মধ্যে, সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। শৃঙ্খলা ও নিয়মনীতি রক্ষার জন্য কিছু অনুশাসন পালন করতে হয়। হিন্দুধর্মেও কিছু অনুশাসন রয়েছে। শারীরিক সুস্থতার জন্য আমরা সকালে উঠে দাঁত মাজি, মুখ ধুই, স্নান করি, পরিষ্কার জামা-কাপড় পরি। যদি আমরা নিয়মিত এটা না করি তাহলে আমরা অসুস্থ হই। ঠিক একইভাবে আমাদের কিছু ধর্মীয় নিয়মনীতি পালন করতে হয়। এই নিয়মনীতি বা অনুশাসন পালন করলে আমাদের শরীর ও মন দুই-ই ভালো থাকে। মনে রাখতে হবে, শরীর ও মন পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। শরীর ভালো থাকলে মন ভালো থাকে। মন ভালো থাকলে শরীর ভালো থাকে। এখানে হিন্দুধর্মীয় কিছু বিধিবিধান ও অনুশাসন সম্পর্কে বলা হলো:

প্রথমেই নিয়ম মেনে আমাদের নিত্যকর্ম করতে হবে। এগুলো হলো প্রাতঃকৃত্য, পূর্বাহ্নকৃত্য, মধ্যাহ্নকৃত্য, অপরাহ্নকৃত্য, সায়ংকৃত্য ও রাত্রিকৃত্য।

প্রাতঃকৃত্য:

প্রাতঃকালে যে কাজ করা হয় তা প্রাতঃকৃত্য। সূর্যোদয়ের আগে ঘুম থেকে উঠতে হয়। বিছানায় বসে দেবদেবীর নাম স্মরণ করতে হয়। দেবী দুর্গার নাম নিতে হয়। দেবদেবী বা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়। প্রাতঃকৃত্যের একটি মন্ত্র:

ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনিরাহুকেতুঃ কুর্বন্তু সর্বে মম সুপ্রভাতম্।।

(চতুর্দশ অধ্যায়, বামন পুরাণ)

[**সন্ধিবিচ্ছেদ:** মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী = মুরারিঃ + ত্রিপুরান্তকারী; বুধশ্চ = বুধঃ + চ; কুর্বন্তু = কুর্বন্ + তু]

সরলার্থ: ব্রহ্মা, মুরারি, ত্রিপুরের বিনাশকারী শিব, সূর্য, চন্দ্র, বুধ, গুরু বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু, সকলে আমার সকালটিকে সুন্দর করুন।

পূর্বাহ্নকৃত্য:

সকাল এবং দুপুরের মধ্য সময়ে যে কৃত্য করা হয় তা পূর্বাহ্নকৃত্য। এই সময়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে প্রার্থনা এবং পূজা করতে হয়। এই সময়ই আহার ও অধ্যয়ন করতে হয়। কর্মস্থল ও বিদ্যালয়ে যেতে হয়। সকলেরই এটা পালন করা উচিত।

মধ্যাহ্নকৃত্য:

পূর্বাহ্নের পর এবং অপরাহ্নের পূর্ব পর্যন্ত যে কৃত্য তা-ই মধ্যাহ্নকৃত্য। এই সময়টা মূলত দুপুরবেলা। দুপুরের কৃত্য হলো খাওয়া-দাওয়া এবং বিশ্রাম করা।

অপরাহ্নকৃত্য:

দুপুরের পর এবং সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত যে কৃত্য তা অপরাহ্নকৃত্য। এটা মূলত বিকালবেলা। এই সময়ে আমাদের নিজের এবং পরিবারের প্রয়োজনীয় কাজ করতে হয়। খেলাধুলা ও ব্যায়ামের জন্য এটা উপযুক্ত সময়।

সায়ংকৃত্য:

সায়ং বা সায়াহ্ন শব্দের অর্থ সন্ধ্যা। এই সময়ে হাত-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হয়। তারপর ঈশ্বরের নাম করতে হয়।

রাত্রিকৃত্য:

সন্ধ্যার পর থেকে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই কৃত্যের সময়। এই সময়ে অধ্যয়ন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ করতে হয়। তারপর রাত্রের আহার করতে হয়। আহারের পর ঘুমাতে যেতে হয়। ঘুমানোর আগে শ্রীবিষ্ণুর 'পদ্মনাভ' নাম স্মরণ করতে হয়।

অনুশাসন অনুযায়ী মাতা, পিতা, শিক্ষক ও গুরুজনদের শ্রদ্ধা করতে হবে। শাস্ত্রে আছে—'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্যদেবো ভব।' অর্থাৎ মাতা, পিতা ও আচার্যকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করতে বা শ্রদ্ধা জানাতে হবে। অতিথিকেও দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধা জানানোর কথা আছে—'অতিথিদেবো ভব।'

হিন্দুধর্মীয় অনুশাসনে বৃক্ষ এবং পশুপাখির সেবার কথাও বলা হয়েছে। বৃক্ষরোপণ, বৃক্ষ ও পশুপাখির পরিচর্যা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

সব মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করাও ধর্মীয় অনুশাসনের অন্তর্গত। ধর্মীয় অনুশাসন পালন করলে আমাদের শরীর ও মন ভালো থাকে। পারিবারিক সম্পর্ক দৃঢ় হয়। সামাজিক শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। এগুলো আমাদের নৈতিক শিক্ষারও অন্তর্গত। হিন্দুধর্মীয় বিধি-বিধান ও অনুশাসন অনুশীলন করে আমরা আদর্শ মানুষ হতে পারি।

ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা কেন গুরুত্বপূর্ণ তা সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে লেখ:

... ...
... ...
... ...
... ...
... ...

অনুশীলনী

(ক) সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. প্রত্যেক ধর্মেরই কিছু ..... আছে।
২. শরীর ও মন পারস্পরিক .....।
৩. নিয়ম মেনে আমাদের ..... করতে হবে।
৪. সূর্যোদয়ের আগে ..... থেকে উঠতে হয়।
৫. মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, ...ভব।

(খ) বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

বাম	ডান
১. শরীর ভালো থাকলে	শ্রদ্ধা করতে হবে।
২. দেবদেবী বা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে	আমাদের একান্ত কর্তব্য।
৩. অনুশাসন অনুযায়ী মাতা, পিতা, শিক্ষক ও গুরুজনদের	শরীর ও মন ভালো থাকে।
	মন ভালো থাকে।
৪. বৃক্ষরোপণ, বৃক্ষ ও পশুপাখির পরিচর্যা করা	মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়।
৫. ধর্মীয় অনুশাসন পালন করলে আমাদের	ঈশ্বরের নাম করতে হয়।

(গ) সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. ধর্মীয় নিয়মনীতি না মানলে ধর্মের মধ্যে, সমাজের মধ্যে কী দেখা দেয়?

(ক) শৃঙ্খলা (খ) বিশৃঙ্খলা
(গ) ঝগড়া-ঝাটি (ঘ) সংঘাত

২. ধর্মীয় নিয়মনীতি বা অনুশাসন পালন করলে আমাদের কী ভালো থাকে?

(ক) শরীর ও মন দুই-ই ভালো থাকে। (খ) হাত ও পা দুই-ই ভালো থাকে।
(গ) চোখ ও নাক দুই-ই ভালো থাকে। (ঘ) কান ও মুখ দুই-ই ভালো থাকে।

৩. সায়ং বা সায়াহ্ন শব্দের অর্থ কী?

(ক) সকাল (খ) দুপুর
(গ) সন্ধ্যা (ঘ) রাত্রি

৪. শৃঙ্খলা ও নিয়মনীতি রক্ষার জন্য কী পালন করতে হয়?

(ক) শাসন (খ) অনুশাসন
(গ) আদেশ (ঘ) উপদেশ

(ঘ) নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. নিত্যকর্ম কত প্রকার ও কী কী?
২. প্রাতঃকৃত্য কাকে বলে? এ সময় কী কী করতে হয়?
৩. পূর্বাহ্নকৃত্য কাকে বলে? সকলের এটা পালন করা উচিত কেন?
৪. মধ্যাহ্নকৃত্য কাকে বলে? এ সময় কী করা হয়?
৫. অপরাহ্নকৃত্য বলতে কী বোঝায়? খেলাধুলা ও ব্যায়ামের উপযুক্ত সময় কখন?
৬. রাত্রিকৃত্য বলতে কী বোঝায়? ঘুমানোর আগে শ্রীবিষ্ণুর কোন নাম স্মরণ করতে হয়?

ঙ) নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর দাও:

১. হিন্দুধর্মীয় বিধিবিধান ও অনুশাসন পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অনুশীলন করার প্রয়োজনীয়তা আটটি বাক্যে লেখ।
২. তোমার পাঠ্যপুস্তক অবলম্বনে প্রাতঃকৃত্যের মন্ত্রটি সরলার্থসহ লেখ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্তব-স্তোত্র ও প্রার্থনা

উপরের ছবিটি দেখো। তুমি কীভাবে প্রার্থনা করো তা বলো:

স্তব ও স্তোত্রের অর্থ স্তুতি বা প্রশংসা। আমরা যখন কারও প্রশংসা করি, তখন তার নিশ্চয়ই ভালো লাগে। দেবতার মহত্ত্বে, বিরাটত্বে মুগ্ধ হয়ে আমরা তাঁর প্রশংসা করি। এটাই স্তব-স্তোত্র। আবার প্রয়োজনে আমরা কারও কাছে কিছু চাই। দেবতার কাছেও কিছু চাই। এরূপ চাওয়াই প্রার্থনা। নিজের ও জগতের মঙ্গলের জন্য আমরা দেবতা বা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। স্তব-স্তোত্র, প্রার্থনায় আমাদের মন-প্রাণ ভালো হয়। দেবতার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তিতে আমাদের কণ্ঠ সুন্দর হয়, পরিশীলিত হয়।

এখানে বেদ, উপনিষদ, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ও চণ্ডী থেকে স্তব-স্তোত্র এবং একটি বাংলা প্রার্থনামূলক কবিতা দেওয়া হলো:

বেদ

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।।
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।।
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।।

(ঋগ্বেদ, ১/৯০/৬-৮)

[**সন্ধিবিচ্ছেদ:** মাধ্বীর্নঃ = মাধ্বীঃ + নঃ; সন্ত্বোষধীঃ= সন্তু + ওষধীঃ; নক্তমুতোষসো= নক্তম্ +উত + উষসো (সঃ); দ্যৌরস্তু = দ্যৌঃ + অস্তু; মধুমান্নো = মধুমান্ + নঃ; মাধ্বীর্গাবো = মাধ্বীঃ+গাবো (বঃ)।]

সরলার্থ: বায়ুসমূহ মধু বহন করছে; নদীসমূহ মধু ক্ষরণ করছে; ওষধিসমূহ আমাদের নিকট মধুময় হোক। মধুময় হোক দিন ও রাত্রি; মধুময় হোক পৃথিবীর ধূলিকণা, পিতৃসম দ্যুলোক আমাদের নিকট মধুময় হোক। বনস্পতি আমাদের নিকট মধুময় হোক; মধুময় হোক সূর্য; গোসমূহ আমাদের নিকট মধুময় হোক। (এখানে 'মধু' শব্দটি আনন্দদায়ক, সুখকর, মিষ্টতা, মঙ্গলকর প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।)

উপনিষদ

তিলেষু তৈলং দধনীব সর্পিরাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ।
এবমাত্মাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি।

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, ১/১৫)

[**সন্ধিবিচ্ছেদ:** দধনীব= দধনি + ইব; সর্পিরাপঃ= সর্পিঃ + আপঃ; স্রোতঃস্বরণীষু= স্রোতঃসু + অরণীষু; এবমাত্মাত্মনি= এবম্ + আত্মা+আত্মনি; গৃহ্যতেঽসৌ= গৃহ্যতে + অসৌ; সত্যেনৈনং= সত্যেন + এনম্; যোঽনুপশ্যতি= যঃ + অনুপশ্যতি]

সরলার্থ: যেমন তিল থেকে তেল, দধি থেকে ঘৃত, নদীগর্ভে জল, ঘর্ষণে কাঠ থেকে আগুন পাওয়া যায়, সেরূপ যিনি সত্যনিষ্ঠা ও তপস্যার সাথে পরমেশ্বরের ধ্যান করেন, তিনিই পরমাত্মাকে লাভ করে থাকেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।। (১১/৩৮)

[**সন্ধিবিচ্ছেদ:** ত্বমাদিদেবঃ = ত্বম্ + আদিদেবঃ; পুরাণস্ত্বং = পুরাণঃ + ত্বং (ম্); বেদ্যঞ্চ = বেদ্যম্ + চ; পরঞ্চ = পরম্ + চ; বিশ্বমনন্তরূপ = বিশ্বম্ + অনন্তরূপ।]

সরলার্থ: হে অনন্তরূপ, তুমি আদিদেব ও পুরাণ পুরুষ; তুমি এই বিশ্বের পরম আশ্রয়; তুমি জ্ঞাতা, তুমি জ্ঞেয়, তুমি পরম ধাম এবং তোমার দ্বারা ব্যাপ্ত সমগ্র জগৎ।

শ্রীশ্রীচণ্ডী

সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে।। (১১/১১)

[**সন্ধিবিচ্ছেদ:** নমোঽস্তু = নমঃ + অস্তু।]

সরলার্থ: হে নারায়ণী! তুমি সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের শক্তিস্বরূপা, তুমি নিত্যা, তুমি সমস্ত গুণের আশ্রয়, তুমি গুণময়ী, তোমাকে নমস্কার।

বাংলা প্রার্থনামূলক কবিতা

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণধুলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।
নিজেরে করিতে গৌরব দান
নিজেরে কেবলই করি অপমান,
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

আমারে না যেন করি প্রচার
আমার আপন কাজে;
তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ
আমার জীবন-মাঝে।
যাচি হে তোমার চরম শান্তি,
পরানে তোমার পরম কান্তি,
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও
হৃদয়পদ্মদলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

(গীতাঞ্জলি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

তোমার পছন্দের একটি স্তব-স্তুতি/ প্রার্থনামূলক গান নিচে লেখ:

... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...

একটি স্তব-স্তুতি/ প্রার্থনামূলক গান শ্রেণিকক্ষে দলগতভাবে উপস্থাপন করো:

অনুশীলনী

(ক) সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. স্তব ও .... অর্থ স্তুতি বা প্রশংসা।
২. দেবতার সঙ্গে আমাদের .... স্থাপিত হয়।
৩. মধু বাতা .... মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
৪. মাধ্বীর্গাবো .... নঃ।
৫. হে অনন্তরূপ, তুমি আদিদেব ও .... পুরুষ।

(খ) বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

বাম	ডান
১. সকল অহংকার হে আমার	পার্থিবং রজঃ।
২. মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ	হৃদয়পদ্মদলে।
৩. আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও	আমার জীবন-মাঝে।
৪. তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ	ডুবাও চোখের জলে।
	শৃণুয়াম্ দেবাঃ।

(গ) সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. ঋগ্বেদের মন্ত্রে 'মধু' শব্দটি কয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

(ক) দুইটি অর্থে (খ) তিনটি অর্থে
(গ) চারটি অর্থে (ঘ) পাঁচটি অর্থে

২. বায়ুসমূহ মধু কী করছে?

(ক) বহন করছে (খ) গ্রহণ করছে
(গ) ক্ষরণ করছে (ক) প্রদান করছে

৩. তিল থেকে কী পাওয়া যায়?

(ক) ঘৃত (খ) তেল
(গ) চাল (ঘ) মধু

৪. আমাদের নিকট কারা মধুময় হোক?

(ক) চন্দ্র, বুধ, মৃগ (খ) তারা, শুক্র, গজ
(গ) পৃথিবী, শনি, অজ (ঘ) বনস্পতি, সূর্য, গোসমূহ

(ঘ) নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. ঋগ্বেদের স্তোত্রটির সরলার্থ লেখ।
২. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার স্তোত্রটি লেখ।
৩. শ্রীশ্রীচণ্ডীর স্তোত্রটি সরলার্থসহ লেখ।

ঙ) নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর দাও:

১. স্তব, স্তোত্র ও প্রার্থনা বলতে কী বোঝায়? স্তব, স্তোত্র ও প্রার্থনার গুরুত্ব লেখ।
২. তোমার পাঠ্যপুস্তক অবলম্বনে উপনিষদের স্তোত্রটি সরলার্থসহ লেখ।
৩. তোমার পাঠ্যপুস্তক অনুসারে বাংলা প্রার্থনা কবিতাটির প্রথম আট লাইন লেখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অবতার ও আদর্শ জীবনচরিত

প্রথম পরিচ্ছেদ

অবতার

পৃথিবীটা খুব সুন্দর। এখানে সবাই শান্তিতে বাস করতে চায়। তবে কিছু মানুষ আছে; যারা কেবল নিজেরা ভালো থাকতে চায়। তারা অন্যায়ভাবে দুর্বলের উপর অত্যাচার করে। শোষণ করে; কিন্তু বিবেকবান মানুষ অসহায়ের পক্ষে দাঁড়ান। সাহায্যের হাত বাড়ান। অত্যাচারীর হাত থেকে নিপীড়িতকে রক্ষা করেন। তখন সেই দুর্বল নিপীড়িত মানুষ আবার প্রাণে শক্তি ফিরে পায়। শান্তি পায়। অনেক সময় অত্যাচারীরা ভয়ংকর হয়ে ওঠে। তাদের অত্যাচারে মানুষ দুঃসহ কষ্ট ভোগ করে। বহু মানুষের মৃত্যু হয়। সেই অত্যাচারী মানুষের হাত থেকে কেউই রক্ষা পায় না। তখন সাধারণ মানুষ খোঁজে কোনো ত্রাতাকে। ঈশ্বর এই ত্রাতা হয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। এরূপ ত্রাতাকে বলা হয় অবতার। অবতারগণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। অবতীর্ণ হয়ে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন।

ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। ঈশ্বর সকল প্রাণীর দেহে আত্মারূপে অবস্থান করেন। কখনো তিনি নিরাকার ব্রহ্ম। আবার কখনো তিনি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাকার রূপ ধারণ করেন। ঈশ্বর দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। মানবকল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে ঈশ্বর বিশেষরূপে অবতার হিসেবে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। এ সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন:

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।। (৪/৭-৮)

[**সন্ধিবিচ্ছেদ:** গ্লানির্ভবতি = গ্লানিঃ + ভবতি; অভ্যুত্থানমধর্মস্য = অভ্যুত্থানম্ + অধর্মস্য; তদাত্মানং = তদা + আত্মানং; সৃজাম্যহম্ = সৃজামি + অহম্।]

সরলার্থ: হে ভারত (অর্জুন), যখনই ধর্মের অবনতি হয় এবং অধর্ম বেড়ে যায়, তখনই আমি দেহধারণ করে আবির্ভূত হই। সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

পৃথিবীতে ঈশ্বরের এরূপ আবির্ভাবকে অবতার বলা হয়। ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে, বিষ্ণুর অবতার অসংখ্য। তবে বিষ্ণুর দশ অবতারের কথাই অধিক প্রচলিত। জগতের মঙ্গলের জন্য ভগবান বিষ্ণু সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চার যুগে দশ অবতাররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। যথা: সত্যযুগে—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ ও বামন; ত্রেতাযুগে—পরশুরাম ও রাম; দ্বাপরযুগে—বলরাম এবং কলিযুগে—বুদ্ধ ও কল্কি অবতার। এখানে আমরা পরশুরাম ও রাম অবতার সম্পর্কে জানব।

পরশুরাম

ত্রেতা যুগের কথা। এক সময়ে ক্ষত্রিয় রাজারা খুব অত্যাচারী হয়ে ওঠেন। তাঁদের অত্যাচারে সমাজ পাপে পূর্ণ হয়। সবার সুখ-শান্তি চলে যায়। মানুষ পরিত্রাণের উপায় খুঁজতে থাকে। তখন ভগবান বিষ্ণু পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হন। পরশুরাম ছিলেন বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার। পরশুরামের পিতার নাম জমদগ্নি। মাতা রেণুকা। ভৃগুবংশে জন্ম বলে তিনি ভার্গব ও ভৃগুরাম নামেও পরিচিত। ভৃগুরাম মহাদেবের তপস্যা করেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাঁকে একটি পরশু বা কুঠার দান করেন। এই পরশু হাতে থাকলে তিনি হবেন অজেয়। কেউ তাঁকে পরাজিত করতে পারবে না।

এই সময় কার্তবীর্য নামে প্রবল শক্তিশালী এক রাজা ছিলেন। একদিন তিনি জমদগ্নির আশ্রমে উপস্থিত হন। জমদগ্নি তখন একা ছিলেন। কার্তবীর্য আশ্রম লন্ডভন্ড করেন এবং কামধেনু হরণ করেন। পরশুরাম পিতার আশ্রমে এসে সব জানতে পারেন। তিনি খুবই ক্রুদ্ধ হন। কার্তবীর্যকে তিনি আক্রমণ করে হত্যা করেন।

অন্যদিকে কার্তবীর্যের ছেলেরা একদিন আশ্রম ফাঁকা পেয়ে জমদগ্নিকে হত্যা করেন। পরশুরামের মা রেণুকা তাঁর স্বামীর এমন মৃত্যুতে হাহাকার করতে থাকেন। পরশুরাম তখন আশ্রমে ছিলেন না। আশ্রমে ফিরে এসে সব জানতে পারেন। পিতার মৃত্যুতে তিনি প্রচন্ড রেগে যান। পরশুরাম তখন কুঠার হাতে ধাবিত হন কার্তবীর্যের নগরীতে। তিনি কার্তবীর্যের ছেলেদের একে একে হত্যা করেন। এরপর তিনি প্রতিজ্ঞা করেন পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করবেন। এভাবে পরশুরাম একুশ বার অত্যাচারী ক্ষত্রিয়দের হত্যা করেন। পৃথিবী শান্ত হয়। পিতামহ ঋচীকের অনুরোধে পরশুরামও শান্ত হয়ে যান। এরপর পরশুরাম চলে যান মহেন্দ্রপর্বতে। সেখানে তিনি কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হন। পৃথিবীতে শান্তি ফিরে আসে। ধর্মের জয় হয়।

পরশুরামের গুণাবলি লেখ:

শ্রীরামচন্দ্র

ত্রেতা যুগের শেষ দিকে রাবণ নামে এক রাক্ষস লঙ্কার রাজা হন। তাঁর পিতার নাম বিশ্রবা ও মাতার নাম নিকষা বা কৈকসী। তিনি ব্রহ্মার কঠোর তপস্যা করেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাঁকে বর দেন। ব্রহ্মার বরে রাবণ অজেয় হন। দেব, দানব, গন্ধর্ব, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, কিন্নর সবাইকে তিনি জয় করেন। তাঁর শক্তিতে স্বর্গের দেবতারা অসহায় হয়ে পড়েন। রাবণের অত্যাচারে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। দেবতারা রাবণকে বধ করার উপায় খুঁজতে

থাকেন। সকল দেবতা একদিন ভগবান বিষ্ণুর কাছে যান। তখন বিষ্ণু তাঁদের আশ্বাস দেন যে, তিনি অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হবেন। তারপর অত্যাচারী রাবণকে বধ করবেন।

দশরথ ছিলেন ইক্ষাকু বংশের রাজা। তাঁর ছিল তিন রানি—কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। তিন রানির গর্ভে চার পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। কৌশল্যার গর্ভে রাম, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত, সুমিত্রার গর্ভে যমজ লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে রাম সবার বড়ো। এই রামই হলেন ভগবান বিষ্ণুর অবতার। আর বাকি তিনজন ভগবান বিষ্ণুর অংশ। কুলগুরু মহর্ষি বশিষ্ঠের কাছে তাঁরা শিক্ষা লাভ করেন। রামের জন্ম হয় চৈত্র মাসে। শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে। এজন্য এ তিথিটি রামনবমী নামে পরিচিত।

তখন মিথিলার রাজা ছিলেন জনক। জনকের দুই কন্যা—সীতা ও ঊর্মিলা। জনকের ভাই কুশধ্বজেরও দুই কন্যা—মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তি। জনকের বিশাল এক ধনু ছিল। এর নাম হরধনু বা শিবের ধনু। জনক প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যে হরধনু ভাঙতে পারবে তার সঙ্গে সীতার বিয়ে দিবেন। রাম হরধনু ভেঙে সীতাকে বিয়ে করেন। বিবাহ অনুষ্ঠানে ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন উপস্থিত ছিলেন। তাঁদেরও বিয়ে হয়। ভরতের স্ত্রী হলেন মাণ্ডবী। লক্ষ্মণের স্ত্রী ঊর্মিলা। শত্রুঘ্নের স্ত্রী শ্রুতকীর্তি। রাম অযোধ্যায় সীতার সাথে সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

এ সময় রাজা দশরথ রামের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করেন। তখন দাসী মন্থরা রানি কৈকেয়ীকে কুপরামর্শ দেয়। কোনো এক সময় রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে দুটি বর দিতে চেয়েছিলেন। মন্থরা রানিকে সেই দুটি বর চাইতে বলেন। তখন কৈকেয়ী বর চাইলেন:

‘এক বরে ভরতেরে দেহ সিংহাসন।
আর বরে শ্রীরামেরে পাঠাও কানন॥’

অর্থাৎ প্রথম বরে ভরতকে রাজা করতে হবে। দ্বিতীয় বরে রামকে চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে পাঠাতে হবে। কৈকেয়ীর এ কথা শুনে রাজা দশরথ অজ্ঞান হয়ে পড়েন। রাম সবকিছু জেনে পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাসে যান। স্ত্রী সীতা এবং ভাই লক্ষ্মণও রামের সঙ্গে বনবাসে যান। ভরত কিন্তু রাজা হতে চাননি। তিনি রামের পাদুকা সিংহাসনে রাখেন। রামের প্রতিনিধি হয়ে তিনি রাজকার্য পরিচালনা করেন।

বনবাসকালে রাবণ সীতাকে হরণ করে লঙ্কাপুরীতে নিয়ে যান। সীতাকে উদ্ধারের জন্য রাম-লক্ষ্মণ বানরসেনাদের নিয়ে লঙ্কায় পৌঁছান। সেখানে রাম ও রাবণের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রামের হাতে রাবণ নিহত হন। রাক্ষসকুল ধ্বংস হয়ে যায়। অত্যাচারী রাবণের মৃত্যুতে সর্বত্র শান্তি ফিরে আসে। রাম বিভীষণকে লঙ্কার রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। সীতাকে

উদ্ধার করে রাম অযোধ্যায় ফিরে আসেন। ভরতের অনুরোধে রাম রাজ্যভার গ্রহণ করেন। মহাসমারোহে রামের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়। রামরাজত্বে প্রজারা সুখে-শান্তিতে বাস করত। রাজ্যে কোনো অকাল মৃত্যু ছিল না, প্রজারা ন্যায় বিচার পেত, রাজ্যে কোনো অভাব ছিল না। রাজ্যময় শান্তি বিরাজ করত।

রাম বিষ্ণুর সপ্তম অবতার। রামের পিতৃভক্তির তুলনা নেই। মা, ভাই, স্ত্রী ও বন্ধুর প্রতি ভালোবাসায়ও রাম ছিলেন অসাধারণ। রাম যেমন ছিলেন বীর তেমনি বিনয়ী ও প্রজাবৎসল। তাঁর মধ্যে কোনো অহংকার ছিল না। আবার অত্যাচারীদের দমনে তিনি ছিলেন নির্ভীক ও কঠোর।

রামরাজত্বে প্রজারা যেসব সুবিধা ভোগ করত, তা দলগতভাবে আলোচনা করে পোস্টার পেপারে লেখ:

অনুশীলনী

(ক) সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. ঈশ্বরের ত্রাতা রূপকে বলা হয়..................।
২. পরশুরাম ছিলেন .... ষষ্ঠ অবতার।
৩. রাম যেমন ছিলেন বীর তেমনি বিনয়ী ও ....।
৪. মহাসমারোহে রামের .... সম্পন্ন হয়।
৫. মিথিলার রাজার নাম ছিল ....।
৬. রামের জন্ম হয় ....।

(খ) বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

বাম	ডান
১. ভগবান বিষ্ণু অবতীর্ণ হন	দশরথ।
২. রাবণ কঠোর তপস্যা করেন	ব্রহ্মার ।
৩. ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা ছিলেন	পরশুরামরূপে।
৪. রাবণ সীতাকে হরণ করে	জনক।
৫. অবতারগণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে	লঙ্কাপুরীতে নিয়ে যান।
	দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন।

(গ) সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. কলিযুগে কোন কোন অবতার অবতীর্ণ হয়েছিলেন?

ক) মৎস্য ও কূর্ম
খ) নৃসিংহ ও বামন
গ) বুদ্ধ ও কল্কি
ঘ) রাম ও বলরাম

২. পরশুরাম কোথায় চলে যান?

ক) মহেন্দ্র পর্বতে
খ) মন্থর পর্বতে
গ) হিমালয় পর্বতে
ঘ) মলয় পর্বতে

৩. পরশুরামের পিতার নাম কী?

ক) জমদগ্নি
খ) ঋচীক
গ) নৃসিংহ
ঘ) দধীচি

৪. লক্ষ্মণের স্ত্রীর নাম কী?

ক) মাণ্ডবী
খ) ঊর্মিলা
গ) শ্রুতকীর্তি
ঘ) সীতা

৫. কে কৈকেয়ীকে কুপরামর্শ দিয়েছিলেন?

ক) মন্থরা
খ) মাণ্ডবী
গ) মালবী
ঘ) মনিকা

৬. রাবণ লঙ্কার রাজা হন কোন যুগে?

ক) কলিযুগে
খ) ত্রেতা যুগে
গ) দ্বাপর যুগে
ঘ) সত্য যুগে

(ঘ) নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. ঈশ্বর সকল প্রাণীর দেহে কীরূপে অবস্থান করেন?
২. ঈশ্বর যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে কী করেন?
৩. ভগবান বিষ্ণু কয়টি যুগে অবতাররূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন?
৪. কে বিভীষণকে লঙ্কার রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন?
৫. ভরত রামের পাদুকা কোথায় রেখেছিলেন?

ঙ) নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর দাও:

১. পরশুরাম কে ছিলেন? তাঁর সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।
২. শ্রীরামচন্দ্রের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে লেখ।
৩. অবতার সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদগীতায় বর্ণিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তিটি সরলার্থসহ লেখ।
৪. কৈকেয়ী কে ছিলেন? তিনি দশরথের কাছে কী কী বর প্রার্থনা করেন?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আদর্শ জীবনচরিত

ছবির নিচে ফাঁকা ঘরে নাম লেখ:

জগতে বহু মানুষ আছে। অধিকাংশ মানুষ শুধু নিজেকে নিয়েই ভাবে; কিন্তু কোনো কোনো মানুষ জগতের সকল মানুষের মঙ্গলের কথা ভাবেন। তাঁদের লোভ বা মোহ থাকে না। পরোপকারই তাঁদের মূল লক্ষ্য। মানবসেবার জন্যই তাঁদের জন্ম। তাঁরা হলেন মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী। এই মহামানবদের জীবন মৃত্যুতে শেষ হয় না। মৃত্যুর পরেও তাঁদের কীর্তি থেকে যায়। কর্মের জন্যই তাঁরা অমরত্ব লাভ করেন।

আমরা দুইজন মহাপুরুষ ও একজন মহীয়সী নারীর কথা জানব।

স্বামী বিবেকানন্দ

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?'—এই বাণীটি তোমরা অনেকেই শুনেছ। কেউ কি তোমরা বলতে পারবে, এই বাণীটি কার? এই বাণীটি স্বামী বিবেকানন্দের। আজ সেই বিবেকানন্দ সম্পর্কে আমরা জানব।

স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতার শিমলা পল্লিতে ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ও মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী। পিতা কলকাতা হাইকোর্টের একজন স্বনামধন্য অ্যাটর্নি ছিলেন। তিনি পুত্রের নাম রাখেন নরেন্দ্রনাথ। তাঁর মা বিশ্বাস করতেন, মহাদেব বীরেশ্বরের আশীর্বাদে তিনি পুত্রসন্তান লাভ করেছেন। তাই তিনি সন্তানের নাম রাখেন বীরেশ্বর। আদর করে সবাই তাঁকে 'বিলে' বলে ডাকত।

মায়ের কাছে নরেন্দ্রনাথের হাতেখড়ি হয়। নরেন্দ্র ছিল খুবই দুরন্ত। তবে অত্যন্ত মেধাবী। পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলা ও গানবাজনায় পারদর্শী ছিল। সেই সাথে তার আধ্যাত্মিক তৃষ্ণাও ছিল প্রবল। সাথিদের নিয়ে 'ধ্যান-ধ্যান' খেলত। কখনো একা একাই গভীর ধ্যানে মগ্ন হতো। সাধু-সন্ন্যাসী দেখলেই তাঁদের কাছে ছুটে যেত।

নরেন্দ্রনাথ ছিল সত্যবাদী ও নির্ভীক। বিদ্যালয়ের একটি ঘটনা থেকে তা জানা যায়। একদিন শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক পাঠদান করছিলেন। নরেন্দ্রনাথ তখন সহপাঠীদের সাথে কথা বলছিল। এতে শিক্ষক রেগে যান। তিনি তাদের পাঠ জিজ্ঞেস করেন। নরেন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ পাঠ বলতে পারেনি। কারণ নরেন্দ্রনাথ পাঠ শুনছিল আবার সহপাঠীদের সাথে কথাও বলছিল। তাই শিক্ষক নরেন্দ্রনাথ বাদে অন্যদের দাঁড়াতে বললেন। সহপাঠীদের সাথে নরেন্দ্রনাথও উঠে দাঁড়াল। শিক্ষক বললেন, 'তোমাকে দাঁড়াতে হবে না।' উত্তরে নরেন্দ্রনাথ বলল, 'আমিও তো কথা বলেছি। অপরাধ তো আমিও করেছি।' তার এই সততা ও নির্ভীকতায় শিক্ষক খুব খুশি হন। নরেন্দ্রনাথের এই সততা ও নির্ভীকতা তার পরবর্তী জীবনেও আমরা দেখতে পাই।

নরেন্দ্রনাথ ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সে বছর ঐ বিদ্যালয় থেকে একজনই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর নরেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু অসুস্থতার কারণে তার পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। পরে জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হন। বর্তমানে এটি স্কটিশ চার্চ কলেজ। এখান থেকে এফএ এবং বিএ পাস করেন। এই সময় তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। তিনি মা ও ছোটো ভাই-বোনদের নিয়ে ভীষণ অর্থকষ্টে পড়েন। সংসারের জন্য তিনি কঠোর পরিশ্রম করেন।

হঠাৎ নরেন্দ্রনাথের মনে এক পরিবর্তন আসে। মনে সদা ঈশ্বর চিন্তা। ঈশ্বর কি আছেন? তাঁকে কি দেখা যায়? এমন প্রশ্ন প্রায়ই তাঁর অন্তরে ঘুরপাক খেতে থাকে। তিনি অনেকের কাছে এ সম্পর্কে জানতে চান; কিন্তু কোথাও সদুত্তর পান না। একসময় দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে সাধক রামকৃষ্ণের সাথে নরেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁর কাছে জানতে চান, 'আপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন?' রামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বলেন, 'হ্যাঁ দেখেছি। যেমন তোকে দেখছি। চাইলে তোকেও দেখাতে পারি।' এমন সরল উত্তরে নরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হলেন। এই প্রথম এমন একজন

মানুষকে দেখলেন, যিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন বললেন। আবার অন্যকেও দেখাতে পারেন। এতেও নরেন্দ্রনাথের মন গলেনি। বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সংশয়মুক্ত হন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঞ্চার হয়। তারপর তিনি রামকৃষ্ণের কাছে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা নেন। রাজপুতানার ক্ষেত্রী রাজা অজিত সিং নরেন্দ্রনাথ দত্তকে স্বামী বিবেকানন্দ নামটি দিয়েছিলেন।

বিবেকানন্দ সংসার ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েন দেশের পথে-প্রান্তরে। দেখতে চান ভারতবর্ষের মানুষের বাস্তব অবস্থা। দেখলেন, সর্বত্র কেবল দারিদ্র্য আর দারিদ্র্য। সাথে অশিক্ষা-কুশিক্ষা আর কুসংস্কার। দেশবাসীর এই শোচনীয় অবস্থা দেখে তিনি মর্মাহত হন। তিনি দারিদ্র্যপীড়িত কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগোষ্ঠীকে উদ্ধারের চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি অনুভব করেন, দেশের দারিদ্র্য, অশিক্ষা-কুশিক্ষা দূর করতে হবে। সবার মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন, 'আগে অন্ন, তারপর ধর্ম।'

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকার শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে যোগ দেন। সম্মেলনে বক্তৃতার শুরুতে তিনি উপস্থিত সকলকে 'ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ' বলে সম্বোধন করেন। তাঁর এই সম্বোধনে উপস্থিত সকলে মুগ্ধ হন। এরপর বিবেকানন্দ তাঁর বক্তৃতায় বলেন, "হিন্দুধর্ম পৃথিবীর সকল ধর্মকে সমান সত্য মনে করে। সব ধর্মের লক্ষ্যই এক। নদীসমূহ যেমন সাগরে গিয়ে মিলিত হয়, তেমনি সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক—ঈশ্বর লাভ।"

তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, "বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।" এই বক্তৃতায় সকলের মধ্যে ধর্ম সম্পর্কে নতুন ভাবনার সৃষ্টি হয়। পারস্পরিক সম্প্রীতির নতুন দিক উন্মোচিত হয়।

পরবর্তী সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ধর্ম-দর্শন বিষয়ে অনেক বক্তৃতা দেন। এতে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বিশ্ববাসী প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হয়। তাঁদের মধ্যে একজন আয়ারল্যান্ডের মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। তিনি বিবেকানন্দের কাছে দীক্ষা নেন। তখন তাঁর নাম হয় ভগিনী নিবেদিতা।

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা হলো 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা।' জীবসেবা করলেই ঈশ্বরসেবা হয়। তিনি জীবসেবার কথা শুধু মুখেই বলেননি, করে দেখিয়েছেন। ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় মহামারি আকারে প্লেগ রোগ দেখা দেয়। তখন তিনি সহযোগীদের সাথে নিয়ে প্লেগ রোগীদের সেবা করেন। তিনি বলতেন—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর সকলেই আমাদের ভাই। এদের সেবাই পরম ধর্ম। কেবল মানুষ নয়, সকল জীবকে তিনি ভালোবাসতেন। ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা করতেন।

বিবেকানন্দ কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। কাজই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান; কিন্তু বিশ্রামের অভাবে অল্প দিনেই তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে। মাত্র ৩৯ বছর ৫ মাস ২৩ দিন তিনি বেঁচেছিলেন। ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দের ৪ জুলাই বেলুড় মঠে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী

১) ওঠো, জাগো এবং লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না।
২) সত্যের জন্য সব কিছু ত্যাগ করা যায়; কিন্তু কোনো কিছুর জন্য সত্যকে ত্যাগ করা যায় না।
৩) পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ। শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম। দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই পাপ।
৪) মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব গোড়া থেকেই রয়েছে, তার বিকাশ সাধনই হচ্ছে ধর্ম।
৫) নিজের ওপর বিশ্বাস না এলে ঈশ্বরে বিশ্বাস আসে না।
৬) ধর্ম এমন একটি ভাব, যা পশুকে মানুষে পরিণত করে আর মানুষকে উন্নীত করে দেবতায়।
৭) জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

স্বামী বিবেকানন্দের কোন কোন আদর্শ তুমি অনুসরণ করতে আগ্রহী তা নিচের ছকে লেখ:

... ...

... ...

... ...

... ...

হরিচাঁদ ঠাকুর

মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য ছিলেন হরিচাঁদ ঠাকুর। তিনি গোপালগঞ্জ জেলার সাফলিডাঙ্গা গ্রামে ১৮১২ সালের ১১ মার্চ কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল যশোমন্ত ঠাকুর আর মাতার নাম অন্নপূর্ণা দেবী। লোকশ্রুতি আছে, অন্নপূর্ণা দেবী একদিন ভাবাবেশে দেখতে পান শিশু শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে মা মা বলে ডাকছেন। আর তাঁর স্তন পান করছেন। সেদিনই সাধু রমাকান্ত তাঁদের বাড়িতে এলেন। অন্নপূর্ণা দেবীর মুখে এ ঘটনা শুনে তিনি বললেন, 'মা অন্নপূর্ণা তোমার গর্ভে বাসুদেব জন্মগ্রহণ করবেন।' এর কিছুদিন পরই তাঁদের ঘর আলোকিত করে হরিচাঁদ জন্ম নিয়েছিলেন। ছোটোবেলায় তার নাম ছিল হরিদাস। কালক্রমে এই হরিদাস ভক্তদের মুখে মুখে হরিচাঁদ ঠাকুর হয়ে ওঠেন।

তখনকার সমাজব্যবস্থার কারণে হরিচাঁদ ঠাকুরের পাঠশালায় যাওয়া হয়নি। তিনি সারাদিন বন্ধুদের সাথে মাঠে-ঘাটে গরু চরিয়ে বেড়াতেন। গল্প-গুজব করে সময় কাটাতেন। আবার কখনো কখনো তিনি ভজন কীর্তন শুনিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে রাখতেন। প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও প্রখর বুদ্ধিমত্তা তাঁর মনকে বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিনির্ভর করে গড়ে তুলেছিল। তখনকার সময়ে গ্রাম-গঞ্জে চিকিৎসার সুযোগ খুব বেশি ছিল না। সাধু-সন্তদের ঝাড়ফুঁক, তাবিজ-কবচই ছিল ভরসা। হরিচাঁদ ঠাকুর ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও প্রখর বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন। তিনি নিজস্ব প্রজ্ঞার বলে গ্রামের লোকদের রোগমুক্তির জন্য প্রাকৃতিক উপায়ে চিকিৎসার বিধান দিতেন। আবার রোগীর মনোবল বৃদ্ধির জন্য রোগীকে সঙ্গে নিয়েই হরিনাম সংকীর্তনে মেতে উঠতেন। গ্রামের লোকেরা শারীরিক কোনো সমস্যায় পড়লে তারা ছুটে ঠাকুরের কাছে আসতেন । ঠাকুর তাদের মনপ্রাণ দিয়ে হরিনাম করতে বলতেন।

ছোটোবেলা থেকেই হরিচাঁদ ঠাকুর ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে ধর্মভাব প্রবল হতে শুরু করে। তিনি সবসময় বলতেন—'ভক্তির সঙ্গে একান্তভাবে হরিনাম করলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।' তিনি বুঝেছিলেন একমাত্র হরিনামের মাধ্যমেই ঈশ্বরকে লাভ করা সম্ভব। তাঁর হরিনাম সংকীর্তনের এই সাধন-ভজনের পথ বা মতবাদের নাম 'মতুয়াবাদ'। আর তাঁর অনুসারীদের বলা হয় 'মতুয়া'। এর অর্থ হচ্ছে যারা হরিপ্রেমে মত্ত থাকে। মতুয়াবাদের তিনটি স্তম্ভ হলো—সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা। মতুয়াবাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মনুষ্যত্ব অর্জন, আত্মোন্নতি এবং সকলের কল্যাণ সাধন।

হরিচাঁদ ঠাকুর সমাজের নিপীড়িত, দুঃখিত মানুষদের জন্য আজীবন কাজ করে গেছেন। তারা যেন আত্মবলে বলীয়ান হয়ে উঠতে পারে—তার ওপরই তিনি সবচেয়ে গুরত্ব দিয়েছেন। তিনি গ্রামের মানুষদের আর্থিক উন্নয়নের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়েছেন। উন্নত পদ্ধতিতে অনাবাদি জমি চাষের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি সবাইকে নিরলসভাবে কাজ করতে বলেছেন।

কৃষকদের প্রতি নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি গোপালগঞ্জ মহকুমার জোনাসুর নীলকুঠি অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন শত বছরের বিধি-নিষেধের অবসান ঘটুক।

তিনি সংসারের দায়িত্ব পালনের ওপর গুরত্ব আরোপ করেন। তিনি নিজেও শান্তিবালা দেবীকে বিয়ে করে সংসার ধর্ম পালন করেছিলেন। তিনি বলতেন, নারীকে অবজ্ঞা করে আদর্শ গার্হস্থ্যধর্ম প্রতিষ্ঠা করা যায় না। নারী শিক্ষা ও নারীর মর্যাদার প্রতিও তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। জাতির উন্নতিকল্পে সকলের মাঝে শিক্ষা প্রসারের জন্যও তিনি আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। তার এ কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরকে তিনি নির্দেশ দিয়ে যান।

হরিচাঁদ ঠাকুর ১৮৭৮ সালের ৬ মার্চ পরলোকগমন করেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর তাঁর ছেলে গুরুচাঁদ মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রধানরূপে পূজিত হন। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় হরিমন্দির রয়েছে। গোপালগঞ্জ জেলার ওড়াকান্দিতে প্রধান হরিমন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিবছর চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে ওড়াকান্দিতে মহাবারুণী স্নান অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় সেখানে বারুণী মেলা বসে। দেশ-বিদেশ থেকে এই মেলায় প্রচুর ভক্তের সমাবেশ ঘটে।

হরিচাঁদ ঠাকুর ভক্তদের বারোটি উপদেশ দিয়েছেন। সেগুলো 'দ্বাদশ আজ্ঞা' নামে পরিচিত:

১) সদা সত্য কথা বলবে।
২) পিতা-মাতাকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করবে।
৩) নারীকে মাতৃজ্ঞান করবে।
৪) জগৎকে প্রেম করবে।
৫) সকল ধর্মের প্রতি উদার থাকবে।
৬) জাতিভেদ করবে না।
৭) হরিমন্দির প্রতিষ্ঠা করবে।
৮) প্রতিদিন প্রার্থনা করবে।
৯) ঈশ্বরে আত্মদান করবে।
১০) বহিরঙ্গে সাধু সাজবে না।
১১) ষড়রিপুকে বশে আনবে।
১২) হাতে কাম মুখে নাম।

ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতা ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ অক্টোবর উত্তর আয়ারল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। নিবেদিতার পিতা স্যামুয়েল রিচমন্ড নোবল একজন ধর্মযাজক ছিলেন। মা মেরি ইসাবেলা ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ নারী। একটি আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে নিবেদিতা বেড়ে ওঠেন। ফলে ছোটোবেলা থেকেই তিনি ধর্মচর্চায় আগ্রহী ছিলেন। তিনি মানুষের পাশে থাকার তীব্র আকর্ষণ অনুভব করতেন।

মাত্র ৩৪ বছর বয়সে মার্গারেটের পিতা স্যামুয়েলের মৃত্যু হয়। তখন মার্গারেটের বয়স দশ বছর। মা মেরি ইসাবেলা সন্তানদের নিয়ে পিতা হ্যামিল্টনের বাড়িতে আশ্রয় নেন। সেখানে নতুন করে শুরু হয় মার্গারেটের পড়ালেখা।

মার্গারেট অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি কৃতিত্বের সাথে হ্যালিফাক্স কলেজ থেকে একাডেমিক শিক্ষার পাঠ শেষ করেন। পরে একটি স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। অবসর সময় কাটানোর জন্য তিনি একটি চার্চে কর্মী হিসেবে যোগ দেন। চার্চের নিয়ম ছিল— কেবল তারাই চার্চের সাহায্য পাবে, যারা চার্চে এসে উপাসনা করবে। চার্চ-কর্তৃপক্ষের এমন নিয়ম মানতে পারেননি মার্গারেট। তাঁর ইচ্ছা অনাহারী, দুস্থ, পীড়িত সবাই চার্চের দেওয়া সাহায্য পাবে; কিন্তু চার্চ-কর্তৃপক্ষ তা মেনে নেননি। কর্তৃপক্ষের এমন মানসিকতা দেখে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন।

স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো-বক্তৃতা শুনে অনেকে অনুপ্রাণিত হন। তাঁদের মধ্যে মার্গারেট একজন। তাঁর ধর্মানুশাসন ও মানবসেবার প্রতি তীব্র আকর্ষণের সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি স্বদেশ ও পরিবার-পরিজন ত্যাগ করে ভারতে চলে আসেন। ভারতীয় শাশ্বত অধ্যাত্ম সাধনার মর্মকথা ও বেদান্তের বাণী শুনে তিনি মুগ্ধ হন। মার্গারেট স্বামীজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। স্বামীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। সেবার মহান ব্রতে নিজেকে সঁপে দেওয়া দেখে স্বামীজী তাঁর নাম দেন নিবেদিতা।

ভগিনী নিবেদিতার অসামান্য ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর ত্যাগধর্মে। একজন বিদেশিনী হয়েও তিনি ভারতবাসীকে একান্ত আপন করে নিয়েছিলেন। মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যালয়টি উত্তর কলকাতার বাগবাজারে অবস্থিত। তিনি ঘুরে ঘুরে সব বয়সের মেয়েদের বিদ্যালয়ে নিয়ে আসতেন। গল্পের ছলে মেয়েদের শিক্ষা দিতেন। সীতা, সাবিত্রী, গান্ধারী প্রমুখ মহীয়সী নারীর জীবনী অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে শোনাতেন। তিনি মেয়েদের বিভিন্ন হাতের কাজ, সেলাই, আলপনা ইত্যাদিও শেখাতেন।

পরাধীন ভারতে নিপীড়িত মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, অশিক্ষা-কুসংস্কার দেখে নিবেদিতার প্রাণ কেঁদে ওঠে। তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে জোরালো ভূমিকা পালন করেন। তিনি মনে-প্রাণে ভারতীয় হয়ে ওঠেন। লোকসেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে 'লোকমাতা' উপাধি দেন।

নিবেদিতা স্বামীজির স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য 'বিবেকানন্দ সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর লেখা দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো—কালী, দ্য মাদার; দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম। কঠোর পরিশ্রমের ফলে মাত্র ৪৪ বছর বয়সে ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ অক্টোবর দার্জিলিংয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এই মহীয়সী নারী। তাঁর স্মৃতিস্তম্ভে লেখা আছে:

এখানে ভগিনী নিবেদিতা শান্তিতে নিদ্রিতা–
যিনি ভারতবর্ষকে সর্বস্ব অর্পণ করেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার জীবনী থেকে এই শিক্ষা পাই যে, মহাপুরুষ বা মহীয়সী নারী সর্বকালের, সর্বলোকের কল্যাণার্থে নিবেদিত। মানবসেবাই তাঁদের মূল লক্ষ্য। আমরা এই শিক্ষা সর্বদা মনে রাখব। আমাদের জীবনে তা অনুসরণ করব।

ভগিনী নিবেদিতার যে আদর্শটি তুমি অনুসরণ করতে আগ্রহী তা লেখ:

... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...

অনুশীলনী

(ক) সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. ‘বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ --------------?’
২. ভগিনী নিবেদিতা ----------------- জন্মগ্রহণ করেন।
৩. জীবসেবা করলেই ------------------- হয়।
৪. -------------------- মাধ্যমেই ঈশ্বরকে লাভ করা সম্ভব।
৫. হরিচাঁদ ঠাকুর ভক্তদের --------------------- উপদেশ দিয়েছেন।

(খ) বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

বাম	ডান
১. মানবসেবার জন্যই	পারদর্শী ছিলেন।
২. পড়ালেখার পাশাপাশি নরেন্দ্রনাথ খেলাধুলা ও গান-বাজনায়	মহামানবদের জন্ম।
৩. বিবেকানন্দের কাছে দীক্ষা নেন	প্লেগ রোগ দেখা দেয়।
৪. ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় মহামারি আকারে	ভগিনী নিবেদিতা।
৫. হরিচাঁদ ঠাকুরের স্ত্রী	উদার থাকবে।
	শান্তিবালা দেবী।

(গ) সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. কার কাছে নরেন্দ্রনাথের হাতেখড়ি হয়?

ক) বাবা খ) মা
গ) ভাই ঘ) পণ্ডিত

২. 'ওঠো, জাগো এবং লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না।'—বাণীটি কার?

ক) ভগিনী নিবেদিতা খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
গ) স্বামী বিবেকানন্দ ঘ) রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

৩. কত সালে স্বামী বিবেকানন্দ মারা যান?

ক) ১৯০২ খ) ১৯০৫
গ) ১৯০৩ ঘ) ১৯০৬

৪. হরিচাঁদ ঠাকুর কোন সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য ছিলেন?

ক) বৈষ্ণব খ) শৈব
গ) জৈন ঘ) মতুয়া

৫. হরিচাঁদ ঠাকুর কত সালে পরলোকগমন করেন?

ক) ১৮৮০ খ) ১৮৯০
গ) ১৮৭৮ ঘ) ১৯৯২

(ঘ) নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. স্বামী বিবেকানন্দের দুটি বাণী লেখ।
২. মানবকল্যাণে ভগিনী নিবেদিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান সম্পর্কে লেখ।
৩. কে নরেন্দ্রনাথের নাম স্বামী বিবেকানন্দ রেখেছিলেন?
৪. মতুয়াবাদের কয়টি স্তম্ভ ও কী কী?
৫. হরিচাঁদ ঠাকুরের উপদেশগুলো কী নামে পরিচিত?

ঙ) নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর দাও:

১. স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লেখ।
২. ভগিনী নিবেদিতা নারীদের কল্যাণে কী করেছেন? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে কী উপাধি দেন?
৩. হরিচাঁদ ঠাকুরের অবদানসমূহ বর্ণনা করো।
৪. হরিচাঁদ ঠাকুর ভক্তদের যে সব উপদেশ দিয়েছেন তার মধ্য থেকে পাঁচটি উপদেশ লেখ।

তৃতীয় অধ্যায়

নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি

প্রথম পরিচ্ছেদ

সহমর্মিতা

শ্রেণিকক্ষে রাতুল দেরিতে আসায় শিক্ষক কারণ জানতে চাইলেন। রাতুল জানায়, আসার সময় বিদ্যালয়ের মাঠে একজন শিক্ষার্থীকে আঘাত পেতে দেখে সে এগিয়ে যায়। ঐ শিক্ষার্থী পায়ে ব্যথা পাওয়ায় হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। রাতুল তাকে হাত ধরে শ্রেণিকক্ষে পৌঁছে দিয়ে এসেছে।

রাতুল কেন এই কাজ করল বলে তোমার মনে হয়? তুমি হলে কী করতে?

... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে বিবেচিত। মানুষের কতগুলো নৈতিক ও মানবিক গুণ রয়েছে। যেমন: সততা, সত্যবাদিতা, সহমর্মিতা, উদারতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সদাচার, পরোপকারিতা প্রভৃতি। সহমর্মিতা একটি বিশেষ নৈতিক গুণ। ধর্মের অঙ্গ। অন্যের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করে সহায়তা করাই হলো সহমর্মিতা। সুখে-দুঃখে কারও প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণই সহমর্মিতা। সহমর্মিতা মানুষকে করে তোলে মহান। তাই আমরা প্রত্যেকে মানুষের জন্য ভালো কিছু করার চেষ্টা করব। মানুষের বিপদে পাশে থাকব।

ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে পাশে লেখ:

… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …

… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …

… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …

আমাদের চারপাশে সহমর্মিতার অনেক ঘটনা ঘটে। এ রকম একটি ঘটনার কথা এখানে জানব।

জয়ের সহমর্মিতা

কুসুমপুর গ্রামে বাস করত জয় ও তার পরিবার। জয় পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। তার পরিবারে ছিল বাবা-মা, ছোটো বোন ও বৃদ্ধ ঠাকুরমা। জয় তার ঠাকুরমাকে অনেক ভালোবাসত। সে তার ঠাকুরমার সেবাযত্ন করত। ঠাকুরমাকে স্নান করতে সাহায্য করত। ঔষধ খেতে সাহায্য করত। ঘুমানোর সময় মশারি টানিয়ে দিত। মাঝে মাঝে ঠাকুরমার কাছে গল্প শুনত। আবার কখনো সেও ঠাকুরমাকে গল্প শোনাত। জয় তার ছোটো বোন রাইকে খুব ভালোবাসত। মা কখনো অসুস্থ হলে রাইকে জয় দেখাশোনা করত। এভাবে আনন্দে কাটছিল তাদের দিন।

একদিন জয় স্কুল থেকে বাসায় ফিরছিল। পথে সে এক বৃদ্ধাকে দেখে দৌড়ে তাঁর কাছে গেল। তিনি একটি ভারী ব্যাগ নিয়ে কষ্ট করে বাজার করে আসছিলেন। জয় তাঁর ব্যাগটা হাতে নিল। বৃদ্ধা তাকে ধন্যবাদ দিয়ে হাঁটতে থাকলেন। জয়ও তাঁর পাশে পাশে হাঁটতে থাকল। জয় জানতে চায়, তিনি কেন বাজার করছেন। বাজার করার জন্য তাঁর বাসায় কি কেউ নেই? বৃদ্ধা একটু হেসে বললেন, না আমি একাই থাকি। আমার ছেলে শহরে থাকে, সেখানে আমার মন টেকে না। সেজন্য আমি মাঝে মাঝে বাড়িতে আসি। এরপর জয় বৃদ্ধাকে তাঁর বাড়ি পৌঁছে দিল।

জয় বাসায় এসে মাকে সব কথা বলল। মা জয়কে বলেন, হ্যাঁ আমি তাঁকে চিনি। তোমার সুবোধ কাকুর মা। তিনি তোমার মণিঠাকুরমা। ছেলে, বউমা দুজনেই চাকরি করে। বাসায় একা থাকতে ভালো লাগে না। তাই মাঝে মাঝে গ্রামে আসেন। জয় বৃদ্ধ মহিলার কথা ঠাকুরমাকে বলে। তখন ঠাকুরমা তাকে বলেন, দাদুভাই, কারও কষ্ট দেখে চুপ করে থাকবে না। সাধ্যমতো সাহায্য করবে। তবেই তো তুমি ভালো মানুষ হবে।

জয় তখন মাকে জিজ্ঞেস করে, মা, আমি কেমন মানুষ? মা তার গাল টিপে বলেন, আমার ছেলে সবার কথা ভাবে। বিপদে এগিয়ে যায়। আমার ছেলে খুব ভালো মানুষ। জয়ের মুখে আনন্দের হাসি। সে দৌড়ে চলে যায় সেখান থেকে। ভাবতে থাকে মণিঠাকুরমার কথা।

জয় স্কুলে কারও বিপদ দেখলেই ছুটে যায়। সাধ্যমতো চেষ্টা করে সাহায্য করার। একদিন সে স্কুলে যেতে পারেনি। তার বন্ধু অশোকের খাতা নিল ক্লাসের পড়া দেখার জন্য; কিন্তু দেখল,

তার লেখায় অনেক বানান ভুল ও অস্পষ্টতা রয়েছে। পরে তার বন্ধুকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করল। বন্ধু বলল, আমি পিছন থেকে বোর্ডের লেখা ভালো দেখতে পাই না, ঝাপসা লাগে। তাই আমার লেখায় ভুল হয়। জয় বিষয়টি নিয়ে তার শিক্ষকের সাথে কথা বলল। শিক্ষক তাকে শ্রেণিকক্ষে সামনের বেঞ্চে বসার ব্যবস্থা করে দিলেন। তিনি বললেন, ছেলেটির দৃষ্টিশক্তি কমে গিয়েছে। জয় এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষকের সাথেও আলাপ করে। তার চশমার চাহিদার কথা প্রধান শিক্ষককে বলে। তিনি অশোকের চশমার ব্যবস্থা করে দিলেন।

কিছুদিন পর জয়ের বাবার সাথে পাড়ার এক লোকের দেখা। তিনি বলেন, ভাই আপনার ছেলে সেদিন কী করেছে শুনেছেন? আমার ছেলে স্কুলে খেলতে গিয়ে মাথায় ব্যথা পেয়েছিল। সে শিক্ষকের সঙ্গে থেকে মাথায় ব্যান্ডেজ করে বাসায় নিয়ে আসে। বাবা, মাকে একথা বলছিলেন। হঠাৎ জয়ের কানে আসে বাবার কথা। বাবা বলছেন, তোমার ছেলে তো খুব বুঝতে শিখেছে। তবে দেখো, পড়ালেখার যেন অবহেলা না হয়। কথাটা শুনে সে খুব খুশি হলো। আর মনে মনে বলল, তোমরা চিন্তা করো না। আমি নিয়মিত পড়ালেখা করব। ভালো মানুষ হব।

আমাদের আশেপাশে এমন অনেক মানুষ আছে যাদের একটু সাহায্য প্রয়োজন। তাদের দুঃখকষ্টে সমব্যথী হওয়াই সহমর্মিতা। আমরা সব সময় চেষ্টা করব তাদের বিপদে পাশে দাঁড়াতে। একা ভালো থাকা ভালো থাকা নয়। সকলে মিলে ভালো থাকলেই ভালো থাকা হয়।

তাইতো কবি বলেছেন:

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী'পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।

(সুখ, কামিনী রায়)

গল্পটি থেকে জয়ের মতো কী কী ভালো কাজ তুমি নিজে করবে তা লেখ:

... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...

অনুশীলনী

(ক) সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. মানুষের কতগুলো নৈতিক ও .... গুণ রয়েছে।
২. অন্যের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করে সহায়তা করাই হলো ....।
৩. .... ভালো থাকা ভালো থাকা নয়।
৪. সকলের .... সকলে আমরা।
৫. মানুষের দুঃখকষ্টে .... হওয়াই সহমর্মিতা।

(খ) বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

বাম	ডান
১. মানুষ সৃষ্টির	পাশে থাকব।
২. সহমর্মিতা	শ্রেষ্ঠ জীব।
৩. মানুষের বিপদে	পরের তরে।
৪. প্রত্যেকে আমরা	ধর্মের অঙ্গ।
	নৈতিকতা।

(গ) সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১.সহমর্মিতা হলো–

ক) দক্ষতা　　খ) নৈতিক গুণ

গ) সততা　　ঘ) সাধারণ আচরণ

২. জয় কাকে সেবা যত্ন করত?

ক) বোনকে　　খ) ভাইকে

গ) বন্ধুকে　　ঘ) ঠাকুরমাকে

৩. সমস্যাগ্রস্ত মানুষের দুঃখকষ্টে সমব্যথী হওয়াই–

ক) সততা　　খ) সহমর্মিতা

গ) স্বদেশপ্রেম　　ঘ) উদারতা

৪. জয় পথে কাকে সাহায্য করেছিল?

ক) বৃদ্ধা　　খ) সহপাঠী

গ) কৃষক　　ঘ) জেলে

(ঘ) নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. দুটি নৈতিক গুণের নাম লেখ।

২. মানুষের বিপদে আমাদের কী করা উচিত?

৩. সহমর্মিতা কী?

ঙ) নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর দাও:

১. সহমর্মিতার একটি উদাহরণ নিজের ভাষায় লেখ।

২. 'সকলে মিলে ভালো থাকলেই ভালো'—কথাটি ব্যাখ্যা করো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ

ছবি দেখি ও আলোচনা করি:

উপরের ছবি থেকে যে কোনো চারজনের নাম/পেশা লেখ এবং তাদের সম্পর্কে একটি করে বাক্য লেখ:
উদাহরণস্বরূপ একটি দেখানো হলো:

	কৃষক	খাদ্যশস্যের জন্য আমরা তাদের উপর নির্ভরশীল।
১		
২		
৩		
৪		

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। মানুষ পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী সবাইকে নিয়ে বাস করে। বেঁচে থাকার জন্য অন্যের সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। তেমনি বিপদেও অন্যের সাহায্য নিতে হয়। একসঙ্গে থাকতে হলে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকতে হয়। ভালোবাসা থাকতে হয়।

আমরা প্রতিদিন নানাবিধ কাজে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। আমাদের রোগ-ব্যাধি থেকে সুস্থ হওয়ার জন্য ডাক্তারের সাহায্য নিতে হয়। খাদ্যশস্যের জন্য কৃষকের সাহায্য নিতে হয়। নিরাপত্তার জন্য পুলিশের সাহায্য নিতে হয়। পড়ালেখার জন্য শিক্ষকের সাহায্য নিতে হয়। পথে চলতে আরও অনেকের সাথে দেখা হয়। অনেকের সাহায্য নিতে হয়।

অপরকে শ্রদ্ধা করলে তুমি শ্রদ্ধা পাবে। এটি প্রতিটি সম্পর্কের মূল কথা। প্রত্যেককে সম্মান অর্জন করে নিতে হয়। তাই কর্ম, স্বভাব, ব্যবহার ইত্যাদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পারস্পরিক শ্রদ্ধা-বোধ মানে অন্যের সাথে মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করা। তাদের মূল্যায়ন করা।

একটি সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ থাকতে হয়। তাই আমরা গুরুজনকে শ্রদ্ধা করব। সমবয়সীদের ভালোবাসব। ছোটোদের স্নেহ-আদর করব। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে একসাথে বাস করব। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা থাকলে সমাজে সম্প্রীতি এবং শান্তি বজায় থাকে।

আমরা জানি, জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বর অবস্থান করেন। কারো প্রতি শ্রদ্ধা দেখালে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো হয়। তাই আমরা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ করব। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া একটি নৈতিক গুণ। ধর্মের অঙ্গ। আমরা নৈতিক গুণে সমৃদ্ধ হব।

আমাদের ধর্মগ্রন্থে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের অনেক কাহিনি পাওয়া যায়। এ রকম একটি কাহিনি এখন জানব।

রাজা দশরথ ও বিশ্বামিত্র মুনি

একদিন অযোধ্যার রাজা দশরথ পুরোহিত ও মন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এমন সময় মহামুনি বিশ্বামিত্র এলেন। দশরথ আনন্দের সাথে বিশ্বামিত্রকে স্বাগত জানালেন। কুশলাদি বিনিময়ের পর দশরথ বললেন, হে মুনিবর, অমৃত লাভ করলে আনন্দ হয়। অনাবৃষ্টির পর বৃষ্টি হলে আনন্দ হয়। নিঃসন্তানের পুত্র জন্মালে আনন্দ হয়। কোনো জিনিস হারিয়ে যাওয়ার পর ফিরে পেলে আনন্দ হয়। আপনার আগমনে আমি অনুরূপ আনন্দিত হয়েছি। আপনি কী চান, তা বলুন। আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করব।

দশরথের কথায় বিশ্বামিত্র খুশি হয়ে বললেন, মহারাজ আমি এক যজ্ঞ শুরু করেছি; কিন্তু মারীচ এবং সুবাহু নামে দুই শক্তিশালী রাক্ষস নানাপ্রকার বাধা সৃষ্টি করছে। যজ্ঞবেদির উপর উচ্ছিষ্ট মাংস ও রক্ত ফেলছে। যজ্ঞকালে অভিশাপ দেওয়া ঠিক নয়। সেজন্য আমি ক্রোধ সংবরণ করেছি। আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র মহাবীর রামকে আমার সাথে যেতে অনুমতি দিন। একমাত্র সেই পারবে রাক্ষসদের বিনাশ করতে।

রাজা দশরথ বিশ্বামিত্রকে অনেক শ্রদ্ধা করেন। তাই তিনি বিশ্বামিত্রের বিপদে পাশে দাঁড়ালেন। তিনি রাম-লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের সাথে যেতে বললেন।

বিশ্বামিত্র দশরথের কথায় খুশি হলেন। রাম-লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের সাথে গিয়ে রাক্ষসদের বধ করলেন। বিশ্বামিত্র নির্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন।

এ কাহিনি থেকে আমরা যে নৈতিক শিক্ষা পাই তা হলো—একে অপরকে শ্রদ্ধা করা। মানুষের বিপদে পাশে থাকা।

সবাই মিলে শ্রেণিকক্ষে 'রাজা দশরথ ও বিশ্বমিত্র মুনি'র গল্পটি ভূমিকাভিনয় করো।

অনুশীলনী

(ক) সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. একসঙ্গে থাকতে হলে পরস্পরের প্রতি ..... থাকতে হয়।
২. পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ মানে অন্যের সাথে ..... আচরণ করা।
৩. জীবের মধ্যে ..... ঈশ্বর অবস্থান করেন।
৪. আমরা ..... গুণে সমৃদ্ধ হব।
৫. বিশ্বামিত্র নির্বিঘ্নে ..... সম্পন্ন করলেন।

(খ) বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

বাম	ডান
১. খাদ্যশস্যের জন্য	ভালোবাসব।
২. অপরকে শ্রদ্ধা করলে	অভিশাপ দেওয়া ঠিক নয়।
৩. সমবয়সীদের	কৃষকের সাহায্য নিতে হয়।
৪. ছোটোদের	তুমি শ্রদ্ধা পাবে।
৫. যজ্ঞকালে	স্নেহ-আদর করব।
	উপকৃত হবে।

(গ) সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. বেঁচে থাকার জন্য আমাদের কী প্রয়োজন?

ক) একা থাকা　　খ) অন্যকে এড়িয়ে চলা

গ) অন্যের সহযোগিতা　　ঘ) অন্যের কাজে বাধা দেওয়া

২. আমাদের রোগ-ব্যাধি থেকে সুস্থ হওয়ার জন্য কার সাহায্য নিতে হয়?

ক) ডাক্তার　　খ) সমাজসেবক

গ) ইঞ্জিনিয়ার　　(ঘ) কৃষক

৩. অযোধ্যার রাজা কে ছিলেন?

ক) বিশ্বামিত্র　　খ) দশরথ

গ) লক্ষ্মণ　　ঘ) রাম

৪. কাদের সহযোগিতায় বিশ্বামিত্র নির্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন?

ক) ভরত-শত্রুঘ্ন　　খ) দুর্যোধন-দুঃশাসন

গ) রাম-লক্ষ্মণ　　ঘ) অর্জুন-ভীম

(ঘ) নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. আমরা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ করব কেন?

২. ঈশ্বরের অবস্থান কোথায়?

৩. বিশ্বামিত্রের যজ্ঞকালে কোন দুই রাক্ষস বাধা সৃষ্টি করেছিল?

৪. রাক্ষসদের বধ করলেন কে?

ঙ) নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর দাও:

১. কোন কোন কাজে তোমার অন্যের সাহায্য নিতে হয় তার একটি তালিকা তৈরি করো।

২. 'রাজা দশরথ ও বিশ্বামিত্র মুনি'—গল্পটি থেকে তুমি কী নৈতিক শিক্ষা পেলে তা লেখ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সদাচার

সবাই একসঙ্গে বলো:

দেহ-মনে ভালো কাজে হয় যে মগন
মিথ্যা তেয়াগি সত্যরে করে যে ভজন।
দেহ শুদ্ধ রাখে সদা শুদ্ধ যার মন
সদাচারী কহে তাকে যত জ্ঞানী জন।

সদাচার মানুষের একটি মহৎ গুণ। সদাচার= সৎ+আচার, সৎ অর্থ ভালো। আচার অর্থ আচরণ। সদাচার হলো ভালো আচরণ। প্রতিদিনের কাজকর্মে মানুষ ভালো আচরণ করে। মন্দ আচরণও করে। যে কাজে ভালো আচরণ ও স্বভাব-চরিত্রের প্রকাশ পায় তাকে সদাচার বলে। সদাচার বলতে ঈশ্বরের প্রতি, নিজের প্রতি, পরিবারের প্রতি, মানুষের প্রতি, সমগ্র সৃষ্টির প্রতি উত্তম আচরণ করা বোঝায়। সদাচারী ব্যক্তিকে সবাই ভালোবাসে এবং সম্মান করে। সমাজে শান্তি, সম্প্রীতি, স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষায় সদাচারের গুরুত্ব অপরিসীম। সদাচার একটি নৈতিক গুণ। ধর্মের অঙ্গ।

তোমার ভালো লাগা একজন ব্যক্তির পরিচয় দাও। কেন ভালো লাগে তা লেখ:

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

এখন মহাভারত থেকে যুধিষ্ঠিরের সদাচারের কাহিনি আমরা জানব:

যুধিষ্ঠিরের সদাচার

প্রাচীনকালে হস্তিনাপুর নামে একটি রাজ্য ছিল। হস্তিনাপুরের কাছে ছিল কুরুক্ষেত্র নামে একটি প্রান্তর। কুরুক্ষেত্রে কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। একদিকে পঞ্চপাণ্ডব—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব ও তাঁদের সৈন্য-সামন্ত। অন্যদিকে প্রতিপক্ষ হিসেবে ছিলেন কৌরব—দুর্যোধন, দুঃশাসনসহ এক শত ভাই ও তাঁদের সৈন্য-সামন্ত।

যুধিষ্ঠির ছিলেন পঞ্চপাণ্ডবদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। শিশুকাল থেকেই যুধিষ্ঠির ছিলেন ধার্মিক ও সত্যবাদী। তাঁর প্রকৃতি ছিল শান্ত ও চিন্তাশীল। তিনি প্রথমে হস্তিনাপুরের যুবরাজ এবং পরে রাজা হয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর জেঠতুতো ভাই দুর্যোধনের চক্রান্তে রাজত্ব হারান। দুর্যোধন ছিলেন কৌরবদের প্রধান। রাজ্যের অধিকার নিয়ে অনেক বিবাদ ও ষড়যন্ত্র হয়। সকল ষড়যন্ত্র করেন

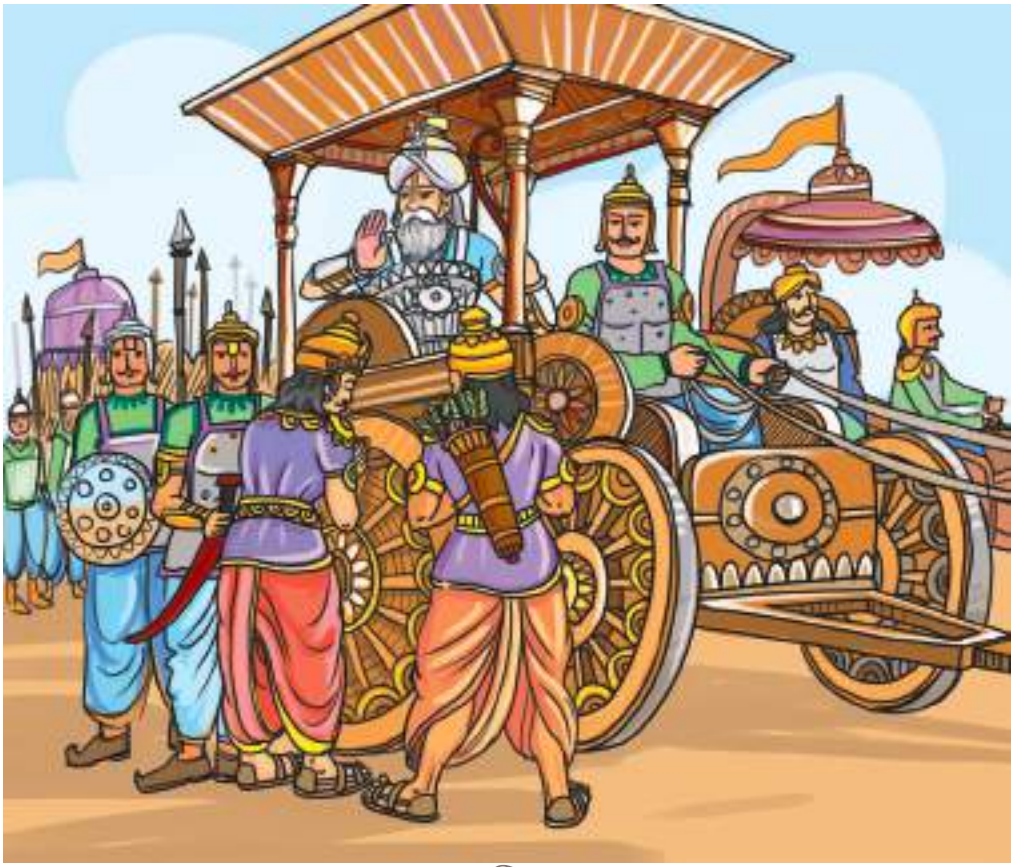

দুর্যোধন। দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে কোনোভাবেই তাঁর প্রাপ্য রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন না। তখন তিনি বাধ্য হন দুর্যোধনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। এই যুদ্ধ হলো অধর্ম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ধর্ম ও ন্যায়ের যুদ্ধ। কুরুক্ষেত্র-প্রান্তরে এই ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে যুধিষ্ঠির হঠাৎ তাঁর বর্ম ও অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করে রথ থেকে নেমে যান। তিনি কৌরব সেনাধ্যক্ষ ভীষ্মের দিকে পায়ে হেঁটে এগিয়ে যান। দুর্যোধন এবং তার সেনারা ভাবেন, যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই সন্ধি করার জন্য আসছেন। অথবা প্রাণ ভিক্ষা চাইবেন। প্রকৃতপক্ষে, যুধিষ্ঠির যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্যের আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে গিয়েছিলেন। ভীষ্ম ছিলেন যুধিষ্ঠিরের পিতামহ। আর দ্রোণ ও কৃপাচার্য ছিলেন তাঁদের অস্ত্রগুরু। তিনি ভীষ্মদেবের কাছে এসে তাঁর পাদস্পর্শ করে বললেন, 'আমরা যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছি। আমাদের আশীর্বাদ করে যুদ্ধের অনুমতি দিন।' ভীষ্ম বললেন, 'যুধিষ্ঠির, তোমার ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়েছি। যুদ্ধে জয়ী হও।' তারপর তিনি দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। দ্রোণাচার্য আশীর্বাদ করে বললেন, 'শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের সখা। যেখানে ধর্ম সেখানেই কৃষ্ণ। যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই জয়'। তারপর কৃপাচার্যকে প্রণাম করলেন। কৃপাচার্যও তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।

এখানে যুধিষ্ঠির তাঁর সদাচারের পরিচয় দিয়েছেন। তাই তিনি তাঁর বিপক্ষে যুদ্ধে দণ্ডায়মান গুরুজনদের কাছেও আশীর্বাদ পেয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, 'বিজয়ী ভব। আয়ুষ্মান্ ভব।' অর্থাৎ বিজয়ী হও। দীর্ঘজীবী হও।

যুধিষ্ঠিরের সদাচারের কাহিনিটি অভিনয় করে দেখাও।

অনুশীলনী

(ক) সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. সদাচার হলো ..... আচরণ।
২. সদাচারী ব্যক্তিকে সবাই ভালোবাসে এবং ..... করে।
৩. যুধিষ্ঠির ছিলেন ..... ও সত্যবাদী।
৪. ভীষ্ম ছিলেন যুধিষ্ঠিরের .....।
৫. যেখানে ..... সেখানেই জয়।

(খ) বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

বাম	ডান
১. আচার অর্থ	তাকে যত জ্ঞানী জন।
২. সদাচারী কহে	দুর্যোধন।
৩. সকল ষড়যন্ত্র করেন	আচরণ।
৪. মহাভারতের যুদ্ধ হলো অধর্ম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে	দুঃশাসন।
৫. যুধিষ্ঠিরের সদাচার	ধর্ম ও ন্যায়ের যুদ্ধ।
	অনুসরণীয়।

(গ) সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. সদাচারী ব্যক্তিকে সবাই–

ক) ভয় পায় খ) এড়িয়ে চলে

গ) দূরে রাখে ঘ) ভালোবাসে

২. যে কাজে ভালো আচরণ ও স্বভাব-চরিত্রের প্রকাশ পায় তাকে কী বলে?

ক) দেশপ্রেম খ) শ্রদ্ধাবোধ

গ) সদাচার ঘ) সহাবস্থান

৩. কুরুক্ষেত্রে কাদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল?

ক) কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে খ) রাম ও রাবণের মধ্যে

গ) দেবতা ও অসুরের মধ্যে ঘ) দশরথ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে

৪. শিশুকাল থেকে যুধিষ্ঠির ছিলেন–

ক) ধার্মিক ও সত্যবাদী খ) জেদি ও একগুঁয়ে

গ) চঞ্চল ও রাগী ঘ) অশান্ত ও কলহপ্রিয়

(ঘ) নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. সদাচার কী?

২. পঞ্চপাণ্ডবদের নাম লেখ।

৩. ভীষ্ম কে ছিলেন?

৪. দ্রোণাচার্য যুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ করে কী বললেন?

ঙ) নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর দাও:

১. যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের কোন কোন দিক তোমার ভালো লেগেছে তা পাঁচটি বাক্যে লেখ।

২. 'যুধিষ্ঠিরের সদাচার' গল্পটি থেকে তুমি কী শিখলে এবং তা নিজের জীবনে কীভাবে অনুসরণ করবে, তা লেখ।

চতুর্থ অধ্যায়

ধর্মগ্রন্থ, দেব-দেবী ও পূজা, মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

হিন্দুধর্মগ্রন্থ

ছবিতে যে গ্রন্থগুলো দেখা যাচ্ছে তা কোন ধরনের গ্রন্থ? কেন এসব গ্রন্থ আমরা পাঠ করব, দলগতভাবে আলোচনা করে নিচে লেখ:

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

সংস্কৃত ধৃ-ধাতু থেকে ধর্ম শব্দটির উৎপত্তি, যার অর্থ ধারণ করা। মানুষ যা ধারণ করে, তা ধর্ম বলে স্বীকৃত। ধর্ম মানুষকে সুখী ও সমৃদ্ধ করে। ধর্ম মানুষকে সুশৃঙ্খল করে। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শান্তি দেয়। জগতের মঙ্গল ও মানুষের কল্যাণ করে। ঈশ্বরকে জানতে ও ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে শেখায়। বিধি-বিধান অনুসারে জীবনকে পরিচালিত করতে শেখায়। ধর্মগ্রন্থে এসব রীতি-নীতির কথা থাকে।

ধর্মগ্রন্থ হলো ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ। পৃথিবীতে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান প্রভৃতি ধর্মের লোক বসবাস করে। প্রত্যেক ধর্মের নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। প্রত্যেক ধর্মগ্রন্থে স্রষ্টার উপাসনার কথা বলা হয়েছে। স্রষ্টার স্তুতি ও তাঁর সৃষ্টির প্রশংসা করা হয়েছে। ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে। অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

হিন্দুধর্মে বহু ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। বেদ আমাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। আরো আছে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, শ্রীশ্রীচণ্ডী প্রভৃতি। যে গ্রন্থে স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টি, জগতের ভালো-মন্দ এবং ধর্মীয় বিভিন্ন আচার-আচরণের উল্লেখ থাকে তা ধর্মগ্রন্থ। হিন্দুধর্মগ্রন্থে ঈশ্বরের মহিমার বিবরণ রয়েছে। দেব-দেবীর উপাখ্যান রয়েছে। বিভিন্ন নীতিশিক্ষা ও উপদেশমূলক কাহিনি রয়েছে। ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে ঈশ্বরকে জানা যায়। মানুষ মঙ্গল ও শান্তির পথ খুঁজে পায়। জীবসেবা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়। শাস্ত্রমতে, ধর্মের পথ অনুসরণ করলে ঈশ্বর লাভ হয়। তাই ধর্মের উপদেশ ও রীতি-নীতি মেনে চলা উচিত।

নিচে ধর্মগ্রন্থ পুরাণ ও শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

পুরাণ

'পুরাণ' শব্দের সাধারণ অর্থ প্রাচীন; কিন্তু এখানে সুপ্রাচীন বা সুদূরের কোনো অতীতকে বোঝাতে 'পুরাণ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যে ধর্মগ্রন্থে সৃষ্টি, প্রলয়, দেবতাদের আখ্যান-উপাখ্যান, ঋষি ও রাজাদের বৃত্তান্ত প্রভৃতি আলোচনা করা হয়েছে তাই পুরাণ। পুরাণে রয়েছে ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি-বিধানের কথা। পুরাণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, চণ্ডী, দুর্গা, গণেশ, সরস্বতী প্রমুখ দেব-দেবীর বিবরণ রয়েছে। পুরাণ থেকে ইতিহাসের কথাও জানা যায়।

অসংখ্য পুরাণের নাম পাওয়া যায়। তবে আঠারোখানা মহাপুরাণ বিশেষভাবে স্বীকৃত। মহাপুরাণগুলো হলো– ১. বিষ্ণু পুরাণ, ২. ভাগবত পুরাণ, ৩. নারদীয় পুরাণ, ৪. গরুড় পুরাণ, ৫. পদ্ম পুরাণ, ৬. বরাহ পুরাণ, ৭. ব্রহ্ম পুরাণ, ৮. ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, ৯. ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, ১০. মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ১১. ভবিষ্য পুরাণ, ১২. বামন পুরাণ, ১৩. শিব পুরাণ, ১৪. লিঙ্গ পুরাণ, ১৫. স্কন্দ পুরাণ, ১৬. অগ্নি পুরাণ, ১৭. মৎস্য পুরাণ ও ১৮. কূর্ম পুরাণ। এছাড়া আঠারোখানা উপ-পুরাণও আছে। পুরাণসমূহে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিনজন দেবতার মাহাত্ম্য প্রাধান্য পেয়েছে।

নিচে ভাগবত পুরাণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো:

ভাগবত পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত নামেও পরিচিত, যা হিন্দুদের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগ্রন্থ। এটি প্রধানত ভক্তিবাদী বৈষ্ণবদের প্রিয় গ্রন্থ। ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে ভাগবতকথা শোনান। পরীক্ষিৎ বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। শুকদেব তার উত্তর দেন। ভাগবতে আঠারো হাজার শ্লোক এবং বারোটি স্কন্ধ আছে। এতে রয়েছে সূর্যবংশ, চন্দ্রবংশ ও যদুবংশের বিবরণ। শ্রীকৃষ্ণসহ বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের বিবরণ। এটি একটি সাত্ত্বিক পুরাণ। এতে জাগতিক কর্মবন্ধন থেকে মুক্তিলাভের কথা বলা হয়েছে। রয়েছে আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের উপায়। এছাড়া আছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলার কথা। অন্য পুরাণগুলোর ন্যায় ভাগবত পুরাণেও বিশ্বতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ আছে। ভক্তদের গৃহে নিত্য ভাগবত পাঠ ও কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। ভাগবত কথা পাঠ করলে ও শুনলে পুণ্যলাভ হয়।

ভাগবত পুরাণের একটি শ্লোক:

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুকম্ ।। (১/২/৭)

[**সন্ধিবিচ্ছেদ:** জনয়ত্যাশু = জনয়তি + আশু; যদহৈতুকম্ = যৎ + অহৈতুকম্।]

সরলার্থ: ভক্তি সহকারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করলে অচিরেই শুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয় এবং জড়-জাগতিক বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য আসে ।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা হিন্দুদের একটি অন্যতম ধর্মগ্রন্থ। এটি ভগবদ্‌গীতা বা গীতা নামেও পরিচিত। এটি মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অংশ। ভীষ্মপর্বের ২৫ থেকে ৪২ পর্যন্ত মোট আঠারোটি অধ্যায় নিয়ে গীতা। কুরুক্ষেত্রে কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে বিশাল এক যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ নামে পরিচিত। যুদ্ধের প্রাক্কালে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন উভয় পক্ষের সেনাবাহিনীতে আত্মীয়-স্বজনদের দেখতে পান। তাঁদের নিধনের কথা ভেবে তিনি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েন। যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জুনকে ন্যায়ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করতে বিভিন্ন উপদেশ দেন, সেই উপদেশই শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার আঠারোটি অধ্যায় ও সাতশত শ্লোক আছে। অধ্যায়গুলো হলো— ১. অর্জুন-বিষাদযোগ, ২. সাংখ্যযোগ, ৩. কর্মযোগ, ৪. জ্ঞানযোগ, ৫. সন্ন্যাসযোগ, ৬. ধ্যানযোগ বা অভ্যাসযোগ, ৭. জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগ, ৮. অক্ষর-ব্রহ্মযোগ, ৯. রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ, ১০. বিভূতিযোগ, ১১. বিশ্বরূপ-দর্শনযোগ, ১২. ভক্তিযোগ, ১৩. ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগযোগ, ১৪. গুণত্রয়-বিভাগযোগ, ১৫. পুরুষোত্তমযোগ, ১৬. দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগযোগ, ১৭. শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগ ও ১৮.মোক্ষযোগ। সাতশত শ্লোক আছে বলে গীতাকে সপ্তশতী বলা হয়।

বিষয়বস্তুর গুরুত্বের কারণে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা স্বতন্ত্র ধর্মগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। এটি মূলত ধর্মতত্ত্ব ও হিন্দুদের জীবন ব্যবস্থার যোগশাস্ত্র। গীতায় মানুষকে দুর্বলতা ত্যাগ করে কর্তব্য কর্মের আহ্বান জানানো হয়েছে। সকল কাজ ঈশ্বরে সমর্পণের মাধ্যমে নিষ্কাম কর্মের দীক্ষা দেওয়া হয়েছে। আত্মার অমরত্বের কথা বলা হয়েছে। গীতা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ও ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানোর সাহস জোগায়। বলা হয়েছে, সংযমী ও শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি জ্ঞান লাভে সমর্থ হন। গীতার বাণী অনুসরণকারী ব্যক্তি মোক্ষলাভ করেন। ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করেন। গীতা হলো সকল শাস্ত্রের সার। এটি হিন্দুদের নিত্যপাঠ্য ধর্মগ্রন্থ।
এখানে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা থেকে দুটি শ্লোক দেওয়া হলো:

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।। (৪/৩৮)

[**সন্ধিবিচ্ছেদ:** পবিত্রমিহ = পবিত্রম্ + ইহ; কালেনাত্মনি = কালেন + আত্মনি।]

সরলার্থ: এ জগতে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র আর কিছু নেই। কর্মযোগে সিদ্ধ পুরুষ সেই জ্ঞান যথাকালে নিজেই অন্তরে লাভ করেন।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ।। (৪/৩৯)

[**সন্ধিবিচ্ছেদ:** সংযতেন্দ্রিয়ঃ = সংযত + ইন্দ্রিয়ঃ; শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি = শান্তিম্ + অচিরেণ + অধিগচ্ছতি।]

সরলার্থ: যিনি শ্রদ্ধাবান, একনিষ্ঠ সাধন-তৎপর এবং জিতেন্দ্রিয় তিনিই জ্ঞানলাভ করেন। জ্ঞানলাভ করে তিনি অচিরেই পরম শান্তি প্রাপ্ত হন।

পাঁচটি করে বাক্য লেখ:

পুরাণ	শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

অনুশীলনী

(ক) সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. ধর্ম শব্দটি এসেছে সংস্কৃত ধৃ-ধাতু থেকে, যার অর্থ .....।
২. ধর্মের পথ অনুসরণ করলে ..... লাভ হয়।
৩. ভাগবত কথা পাঠ করলে ও শুনলে ..... হয়।
৪. সাতশত শ্লোক আছে বলে গীতাকে ..... বলা হয়।
৫. শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি ..... লাভে সমর্থ হন।

(খ) বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

বাম	ডান
১. ধর্মগ্রন্থ হলো	প্রধান ধর্মগ্রন্থ।
২. বেদ আমাদের	ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ।
৩. পুরাণ শব্দের অর্থ হলো	মহাপুরাণ।
৪. শ্রীমদ্ভাগবত একটি	মহাভারতের অংশ।
৫. শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা	প্রাচীন।
	রামায়ণের অংশ।

(গ) সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কোনটি?

ক) মহাভারত　　খ) রামায়ণ
গ) বেদ　　ঘ) শ্রীশ্রীচণ্ডী

২. ভাগবত পুরাণে কোন রাজবংশের বিবরণ নেই–

ক) সূর্যবংশ　　খ) মৌর্যবংশ
গ) চন্দ্রবংশ　　ঘ) যদুবংশ

৩. শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের অনুসারীদের কী বলা হয়?

ক) বৈষ্ণববাদী　　খ) শাক্তবাদী
গ) শ্রৌতবাদী　　ঘ) শৈববাদী

৪. শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় কয়টি অধ্যায় আছে?

ক) ১০টি　　খ) ১৫টি
গ) ১৮টি　　ঘ) ২০টি

(ঘ) নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. পাঁচটি ধর্মগ্রন্থের নাম লেখ।
২. পুরাণ কী? দুইটি পুরাণের নাম লেখ।
৩. কয়েকজন পৌরাণিক দেব-দেবীর নাম লেখ।
৪. ভাগবতকথা কে, কাকে শুনিয়েছিলেন?
৫. যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুন কেন মোহগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন?

ঙ) নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর দাও:

১. ধর্ম আমাদের কী শিক্ষা দেয়? বুঝিয়ে লেখ।
২. কেন মানুষের ধর্মের পথ অনুসরণ করা উচিত?
৩. ভাগবত পুরাণ সম্পর্কে আটটি বাক্য লেখ।
৪. গীতার শিক্ষা কীভাবে তোমার জীবন চলার পথকে সুন্দর করে তোলে তা সংক্ষেপে লেখ।
৫. তোমার পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার শ্লোক দুটি সরলার্থসহ লেখ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দেব-দেবী ও পূজা

কয়েকজন দেব-দেবীর নাম লেখ। যে কোনো একটি পূজা সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ:

দেব-দেবীর নাম	পূজার বর্ণনা
	... ...
	... ...
	... ...

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি অসীম গুণের অধিকারী। তবে তিনি নির্গুণ হয়েও সগুণ। তিনি নিরাকার হয়েও সাকার। তিনি মানব কল্যাণের নিমিত্তে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। সাধকেরা তাঁর শক্তিকে দেব-দেবী রূপে উপাসনা করেন। ঈশ্বরের কোনো গুণ বা ক্ষমতার প্রকাশিত রূপ বা আকারই দেব-দেবী। যেমন: বৈদিক দেবতারা হলেন অগ্নি, ইন্দ্র, সোম, বরুণ, ঊষা, অদিতি, সাবিত্রী প্রমুখ। পৌরাণিক দেবতারা হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ প্রমুখ। তাঁরা সকলেই ঈশ্বরের একেকটি শক্তির প্রতীক। ঈশ্বর যে রূপে জগৎ সৃষ্টি করেন, তিনি ব্রহ্মা। যে রূপে জগৎ প্রতিপালন ও রক্ষা করেন, তিনি বিষ্ণু। আবার যে রূপে সংহার বা ধ্বংস করেন, তিনি শিব। দেবী দুর্গা শক্তির প্রতীক। তিনি শক্তির দেবী। দেবী সরস্বতী বিদ্যা দান করেন। তিনি বিদ্যাদায়িনী।

আগের শ্রেণিগুলোতে আমরা কয়েকজন দেব-দেবী সম্পর্কে জেনেছি। এখানে আমরা অগ্নি দেবতা ও মনসা দেবী সম্পর্কে জানব।

অগ্নি

সাধারণত বৈদিক দেব-দেবী প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক। প্রাচীনকালে মুনি-ঋষিগণ এ সব শক্তিকে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন। তাঁদের চিন্তাশীলতার মাধ্যমে প্রাকৃতিক শক্তিগুলো দেব-দেবীর রূপ লাভ করে। ঋগ্বেদে অগ্নিকে অন্যতম দেবতা হিসেবে স্তুতি করা হয়েছে। তাঁকে পাবক, বহ্নি, বৈশ্বানর, হুতাশন, হোতা, পুরোহিত, দূত, যজ্ঞের অগ্রদূত ইত্যাদি নামে ডাকা হয়। অগ্নি বহুজন্মা। তাঁর তিনটি রূপ। তিনি আকাশে সূর্য, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ এবং পৃথিবীতে অগ্নিশিখারূপে অবস্থান করেন।

ঋগ্বেদ অনুসারে পরমপুরুষ ব্রহ্মার মুখ থেকে অগ্নির উৎপত্তি। অগ্নি জলের গর্ভ স্বরূপ। অগ্নির গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল লাল বা সুবর্ণ। তিনি প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার মতো দীপ্তিময়। তাঁর তিনটি মুখ, চারটি হাত, তিনটি জিহ্বা, সাতটি শিখা বা রশ্মি এবং তিনখানা পা আছে। তাঁর কেশ এবং দাড়ি সোনালি বর্ণের। চোখ দীপ্তিমান। ছাগ তাঁর বাহন। তিনি লালবর্ণের সাতটি ঘোড়া এবং তিনটি চাকা বিশিষ্ট রথে আরোহণ করেন। তিনি সর্বদা জ্যোতির্ময়, কান্তিময় এবং শৌর্যযুক্ত প্রজ্বলিত শক্তির প্রতীক।

অগ্নিকোণ ও পিতৃলোকের অধিপতি হলেন অগ্নিদেবতা। তিনি দেবতাদের জন্য যজ্ঞভাগ বহনকারী ও যজ্ঞের সারথী । বাড়িতে, যজ্ঞশালায় এবং যুদ্ধক্ষেত্র সকল স্থানেই তিনি পূজিত

হন। তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য বৈদিক মন্ত্র পাঠ করা হয়। যজ্ঞকুণ্ডে ঘৃত, তিল, নবধান্য, সমিধ প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে তাঁর হোম করা হয়। তিনি সকল জীবের আশ্রয়স্থল। তাঁর কৃপায় জগতের কল্যাণ সাধিত হয়। তাই আমাদের সকলের অগ্নি দেবতার উপাসনা করা উচিত।

অগ্নির প্রণাম মন্ত্র:

নমো নমস্তে ত্রিপুরারিচক্ষুষে, মখেশ্বরাণাং মখতামুপেয়ুষে।
চরাচরাণাং জঠরেষে স্থীয়তে ত্রিধাবিভক্তয় নমোঽস্তু বহ্নয়ে।।

(পুরোহিত-দর্পণ, পৃষ্ঠা. ৫৬)

[**সন্ধিবিচ্ছেদ:** ত্রিপুরারিচক্ষুষে= ত্রিপুরারি + চক্ষুষে; মখেশ্বরাণাং= মখ + ঈশ্বরাণাম্; মখতামুপেয়ুষে= মখতাম্ + উপেয়ুষে; চরাচরাণাং= চর + আচরাণাম্; নমোঽস্তু= নমঃ + অস্তু।]

সরলার্থ: ত্রিপুরারী শিবের তৃতীয় নয়নরূপ অগ্নিদেবকে প্রণাম! তিনি যজ্ঞের দেবতাদের মুখে পৌঁছান, যজ্ঞ আহুতি গ্রহণ করেন। তিনি জড় ও চেতন সকল সত্তার অন্তরে অবস্থান করেন। তিনি তিনভাগে বিভক্ত হয়ে বিরাজমান, সেই অগ্নিদেবকে আমার প্রণাম।

অগ্নিদেবতার পাঁচটি গুণ লেখ:

১ ... ...

২ ... ...

৩ ... ...

৪ ... ...

৫ ... ...

সকলে মিলে অগ্নিদেবতার প্রণাম মন্ত্রটি সরলার্থসহ পাঠ করো:

মনসা

মা মনসা সর্পের দেবী। তিনি লৌকিক দেব-দেবীদের মধ্যে অন্যতম। মনসার অপর নাম বিষহরা ও পদ্মাবতী। পুরাণ অনুসারে, তিনি ঋষি কশ্যপের কন্যা, নাগরাজ বাসুকির ভগিনী এবং ঋষি জরৎকারুর স্ত্রী। তিনি সর্প পরিবেষ্টিতা। তিনি একটি হংস বা পদ্মের উপর অবস্থান করেন। তিনি হংস এবং সর্পকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করেন। তাঁর গলদেশে সাপ পেঁচানো থাকে। তাঁর হাত চারটি। বাম দিকের দুই হাতে পদ্ম ও সর্প এবং ডান দিকের দুই হাতে

শ্বেতপদ্ম ও বরাভয়। সাতটি বা এগারোটি বা বিয়াল্লিশটি সর্পের ফণা তাঁর মাথার উপর ছাউনির আকারে বিরাজ করে। কথিত আছে, মা চণ্ডীদেবীর ক্রোধের ফলে মনসার একটি চক্ষু নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই তাঁকে একচক্ষু বিশিষ্টা দেবীও বলা হয়।

সাধারণত সর্পদংশনের হাত থেকে রক্ষা পেতে মা মনসার পূজা করা হয়। হিন্দুদের কাছে মা মনসা প্রজনন দেবী হিসেবেও পরিচিত। বিবাহের সময়, সন্তান কামনায় ও ঐশ্বর্য লাভের জন্য মা মনসার পূজা করা হয়। আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে মনসা দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এ তিথিকে নাগপঞ্চমীও বলা হয়। আমাদের দেশে শ্রাবণ মাসের শেষ দিনে অর্থাৎ, সংক্রান্তিতে মনসা দেবীর পূজা করা হয়। মন্দিরে বা পারিবারিকভাবে মনসা দেবীর পূজা করা হয়। মনসাপূজায় ঘট, সিঁদুর, মধু, হরীতকী, তিল, বেলপাতা, পুষ্প, দূর্বা, তুলসী, আম্রপল্লব, দুধ, কলাসহ বিভিন্ন ধরনের উপকরণ প্রয়োজন হয় । মনসা দেবীর কৃপায় আমরা সর্পদংশনের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে থাকি। তিনি আমাদের আশীর্বাদ করেন।

মনসা দেবীর প্রণাম মন্ত্র:

আস্তিকস্য মুনের্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা।
জরৎকারুমুনেঃ পত্নী মনসাদেবী নমোঽস্তু তে।।

[**সন্ধিবিচ্ছেদ:** মুনের্মাতা= মুনেঃ+মাতা; বাসুকেস্তথা= বাসুকেঃ+তথা; নমোঽস্তু= নমঃ+অস্তু।]

সরলার্থ: হে মনসা দেবী, তুমি আস্তিক মুনির মা, বাসুকির বোন, জরৎকারু মুনির পত্নী, তোমাকে নমস্কার।

দেব-দেবীর পূজা করলে ভক্তি-শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়। দেব-দেবীর পূজাকে কেন্দ্র করে বহু লোকের সমাগম হয়। এর মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সংহতির সৃষ্টি হয়। এসব শিক্ষা আমাদের আচার-আচরণে প্রকাশ করব। আমরা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব।

অনুশীলনী

(ক) সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. সাধকেরা তাঁর শক্তিকে ..... রূপে উপাসনা করেন।
২. ঋগ্বেদে .....অন্যতম দেবতা হিসেবে স্তুতি করা হয়েছে।
৩. অগ্নির গাত্রবর্ণ ..... ।
৪. মা মনসার অপর নাম .....।
৫. মনসা দেবী ..... পরিবেষ্টিতা।

(খ) বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

বাম	ডান
১. বৈদিক দেব-দেবী	হংস এবং সর্প।
২. যজ্ঞের অগ্রদূত	ছাগ।
৩. অগ্নির বাহন	কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে।
৪. মা মনসার বাহন	প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক।
৫. মনসা দেবীর পূজা করা হয়	অগ্নিদেবতা।
	শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে।

(গ) সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. বৈশ্বানর, হোতা ও পুরোহিত নামে কোন বৈদিক দেবতাকে ডাকা হয়?

ক) ইন্দ্র　　খ) বরুণ
গ) অগ্নি　　ঘ) যম

২. অগ্নিদেবতা কোন লোকের অধিপতি?

ক) পিতৃলোক　　খ) ভূলোক
গ) দ্যুলোক　　ঘ) স্বর্গলোক

৩. মনসা দেবীর গলায় কী থাকে?

ক) রুদ্রাক্ষের মালা　　খ) সোনার হার
গ) পেঁচানো সাপ　　ঘ) পদ্মমালা

৪. আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে কোন পূজা অনুষ্ঠিত হয়?

ক) শীতলা　　খ) ভাদু
গ) মনসা　　ঘ) বনবিবি

৫. মনসা দেবী কোন ঋষির স্ত্রী ছিলেন?

ক) কশ্যপ　　খ) জরৎকারু
গ) মরীচি　　ঘ) পুলস্ত্য

(ঘ) নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. কোন রূপে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন?
২. অগ্নির রূপ কয়টি ও কী কী?
৩. মা মনসাকে কী কী নামে ডাকা হয়?
৪. কার ক্রোধের ফলে মনসাদেবীর একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়?

ঙ) নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর দাও:

১. দেব-দেবীরা ঈশ্বরের কোন শক্তির প্রতীক? উদাহরণসহ লেখ।
২. অগ্নির দৈহিক গঠন ও বাহন সম্পর্কে লেখ?
৩. যজ্ঞে অগ্নিদেবকে সন্তুষ্ট করতে কোন কোন উপকরণ ব্যবহার করা হয়?
৪. মনসা দেবীর পরিচয় দাও।
৫. মনসা পূজার উদ্দেশ্য কী? তাঁর পূজায় কী কী উপকরণ ব্যবহৃত হয়?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র

তোমরা নিশ্চয় মন্দির বা তীর্থক্ষেত্র দেখেছ। মন্দির বা তীর্থক্ষেত্র হলো পবিত্র স্থান। কেউ মন্দিরে পূজা করতে যায়। কেউ দেবতার আশীর্বাদ লাভ করতে যায়। মন্দিরে গেলে পুণ্যলাভ হয়। অনেকে আবার তীর্থদর্শন ও স্নানের মাধ্যমে পুণ্য লাভ করে।

তোমার এলাকার মন্দির বা তীর্থক্ষেত্রগুলোর নাম লেখ:

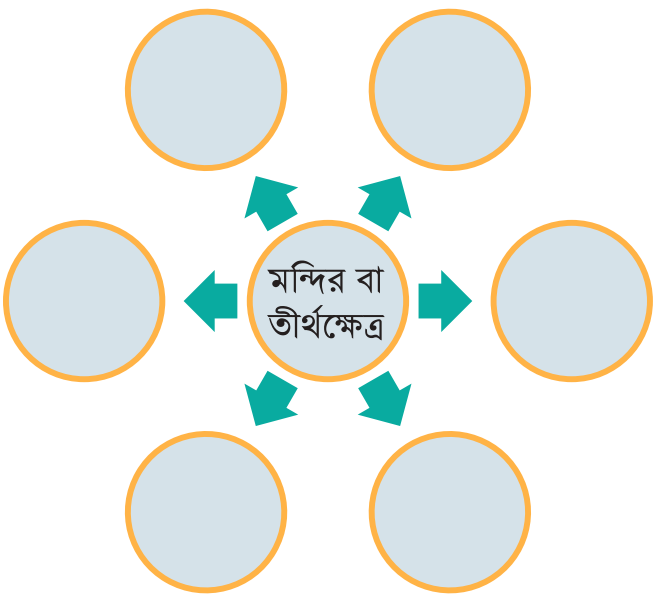

মন্দির

মন্দির হলো দেবালয়। এখানে বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি থাকে। মন্দিরে প্রতিদিন দেবতার পূজা-অর্চনা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দেব-দেবী ও তাঁদের প্রতীকের আলোকে মন্দির নির্মিত হয়। মন্দির একটি আধ্যাত্মিক সাধনার স্থান। দেব-দেবীর নাম অনুসারে মন্দিরের নামকরণ হয়। যেমন: বিষ্ণুমন্দির, শিবমন্দির, দুর্গামন্দির, কালীমন্দির, কৃষ্ণমন্দির ইত্যাদি। তবে একই মন্দিরে বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তিও থাকতে পারে এবং তাঁদের পূজা হতে পারে। স্থানের নামেও মন্দিরের নামকরণ হয়। যেমন: যশোর থেকে যশোরেশ্বরী মন্দির, চট্টগ্রাম থেকে চট্টেশ্বরী মন্দির। এ ছাড়াও পীঠস্থানের মধ্যে অনেক মন্দির গড়ে উঠেছে। যেমন: বদেশ্বরী মহাপীঠ মন্দির, মহালক্ষ্মী গ্রীবাপীঠ মন্দির, ভবানীপীঠ মন্দির, সুগন্ধা শক্তিপীঠ মন্দির প্রভৃতি।

মন্দির পবিত্র স্থান। প্রতিটি মন্দির হলো এক একটি ধর্মক্ষেত্র। এখানে গেলে ভক্তদের দেহ-মন পবিত্র হয়। ভক্তদের মনে ভক্তিভাবের সৃষ্টি হয়। পুণ্যলাভ হয়। ভক্তরা মন্দিরে দেব-দেবী দর্শন করেন। তাঁদের পূজা-অর্চনা করেন। তাঁদের উদ্দেশ্যে ভক্তি নিবেদন করেন। উপাস্য দেব-দেবীর নিকট প্রার্থনা জানান। তাই সকলেরই মন্দিরে গিয়ে দেব-দেবী দর্শন করা উচিত।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বড় বড় মন্দির রয়েছে। যেমন: বাংলাদেশের ঢাকায় ঢাকেশ্বরী মন্দির, দিনাজপুরে কান্তজী মন্দির। ভারতের কলকাতায় কালীঘাটের কালীমন্দির, দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দির, পুরীতে জগন্নাথ মন্দির ইত্যাদি।

নিচে দিনাজপুরের কান্তজী মন্দির ও পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের বিবরণ দেওয়া হলো:

কান্তজী মন্দির

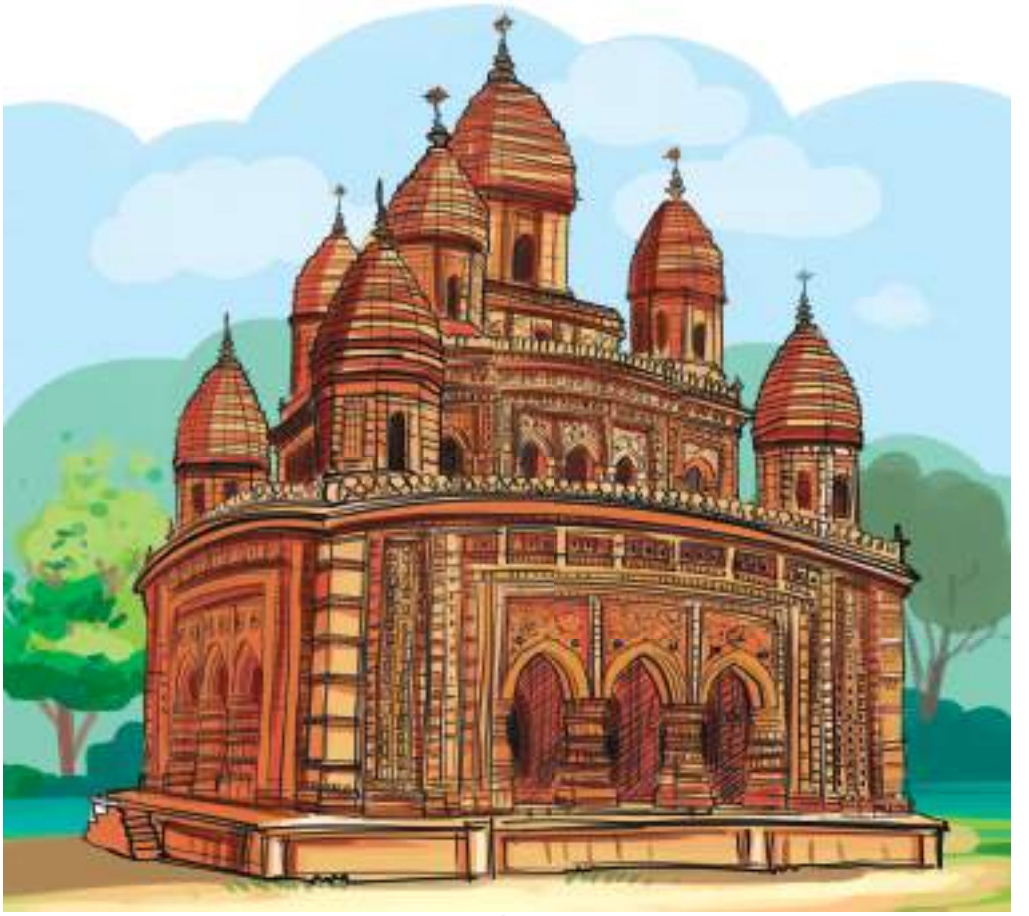

কান্তজী মন্দির দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত। মন্দিরটি দিনাজপুর শহর থেকে ২০ কিলোমিটার উত্তরে ঢেপা নদীর তীরে অবস্থিত। এটি মধ্যযুগের মন্দির। ১৭০৪ খ্রিষ্টাব্দে মহারাজ প্রাণনাথ রায় মন্দিরের নির্মাণ কাজ শুরু করেন; কিন্তু তিনি মন্দিরের কাজ শেষ করে যেতে পারেননি। ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর পুত্র রাজা রামনাথ রায় মন্দিরটি সম্পন্ন করেন। মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর পত্নী রুক্মিণীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের অপর নাম রুক্মিণীকান্ত । তাই মন্দিরটির নাম রুক্মিণীকান্ত বা কান্তজী। মূল মন্দিরটি ছিল বর্গাকৃতির। চূড়াসহ যার উচ্চতা ছিল ৭০ ফুট। বর্তমানে এর উচ্চতা ৫০ ফুট। মন্দিরে নয়টি শিখর বা চূড়া ছিল। এ জন্য মন্দিরটিকে নবরত্ন মন্দিরও বলা হতো। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ভূমিকম্পে সবগুলো শিখর ধ্বংস হয়ে যায়। বিশ শতকের গোড়ার দিকে মহারাজ গিরিজানাথ মন্দিরের সংস্কার করলেও চূড়াগুলো সংস্কার করেননি।

মন্দিরের নির্মাণ কৌশল অপূর্ব। মন্দিরের গায়ে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি, পৌরাণিক কাহিনি, যুদ্ধযাত্রা, নৌকাভ্রমণের দৃশ্য প্রভৃতি পোড়ামাটির ফলকে খোদিত হয়েছে। কী সুন্দর তার শোভা! কী অপরূপ তার কারুকাজ! এখানে আমাদের দেশের সর্বোৎকৃষ্ট টেরাকোটা শিল্পের নিদর্শন রয়েছে। মন্দিরটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে।

এ মন্দিরে প্রতিদিন পূজা-অর্চনা হয়। শীতকালের শুরুতে মন্দির প্রাঙ্গণে মাসব্যাপী রাসমেলা অনুষ্ঠিত হয়। মহারাজ রামনাথ রায়ের সময় থেকে এই রাসমেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। মেলার সময় দেশ-বিদেশ থেকে বহু ভক্তের সমাগম হয়। তাঁরা দেবতার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। এতে সকলের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি হয় সম্প্রীতির সেতুবন্ধন।

পুরীর জগন্নাথ মন্দির

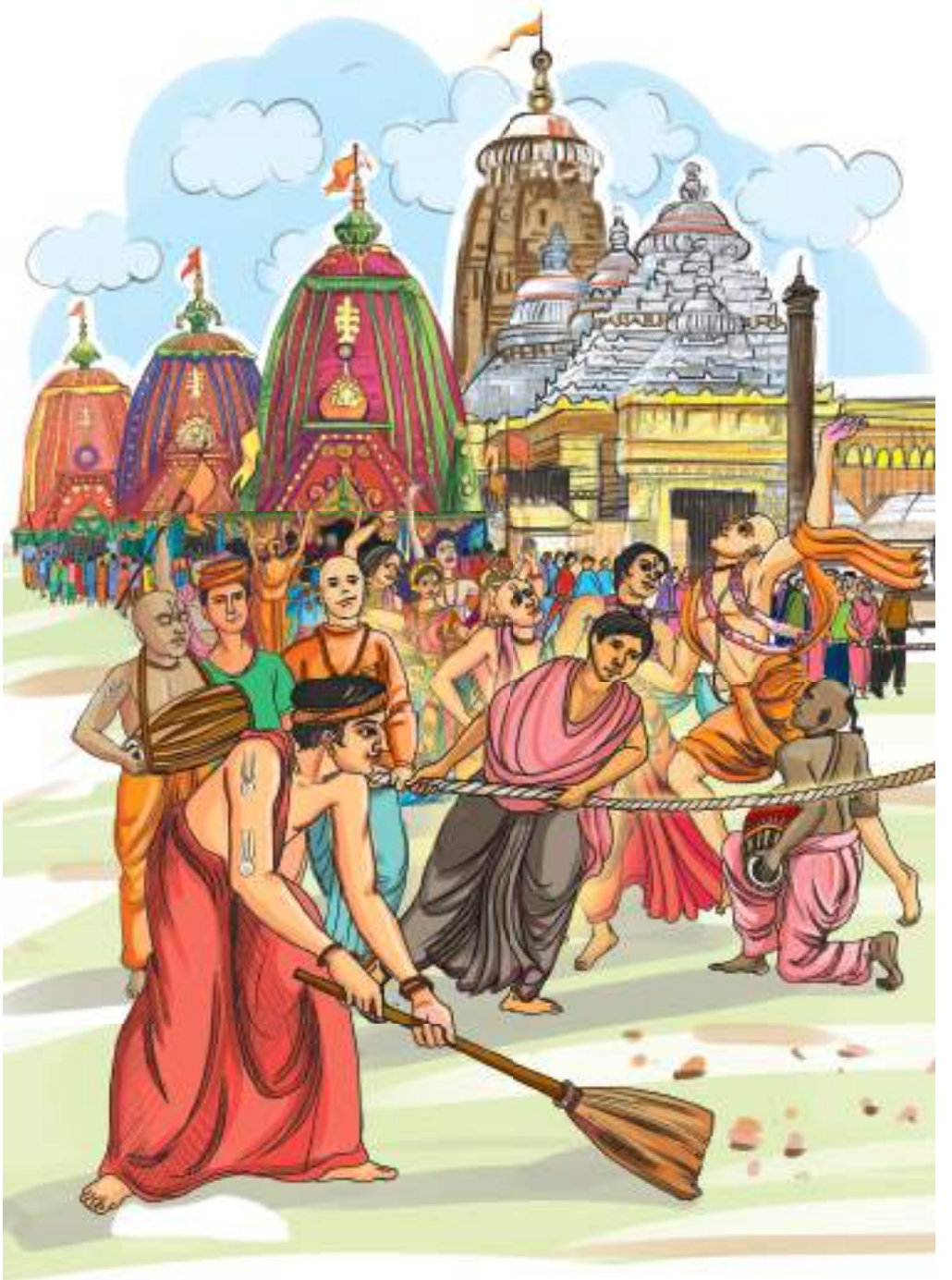

ভারতের উড়িষ্যার পুরীতে জগন্নাথ মন্দির অবস্থিত। এটি পুরীর সর্ববৃহৎ মন্দির। বঙ্গোপসাগরের তীরে এই মন্দিরটি অবস্থিত। রাজা অনন্তবর্মণ দ্বাদশ শতাব্দীতে এটি নির্মাণ করেছিলেন। জগন্নাথ মন্দিরটি উঁচু পাথরের উপরে নির্মিত। মন্দিরের প্রাচীরে চারটি দরজা রয়েছে। এগুলো হলো: সিংহ দরজা, হস্তী দরজা, অশ্ব দরজা ও ব্যাঘ্র দরজা। মন্দিরে ওঠার জন্য সিঁড়িতে বাইশটি ধাপ রয়েছে। ভক্তদের জন্য মন্দিরের দরজা ভোর পাঁচটায় খোলা হয়। দিনের শুরুতে মঙ্গল আরতির মাধ্যমে পূজা-অর্চনা শুরু হয়।

বিষ্ণুর একটি রূপ জগন্নাথ। এ মন্দিরের নাম জগন্নাথ মন্দির হলেও এখানকার আরাধ্য দেবতা একমাত্র জগন্নাথ নন। তাঁর সঙ্গে বলরাম এবং সুভদ্রার মূর্তিও রয়েছে। এই তিন দেবতা হলো ঈশ্বরের ত্রয়ীরূপ। প্রতিদিন পৃথিবীর নানা স্থান থেকে হাজার হাজার ভক্ত আসেন জগন্নাথ মন্দিরে। এই মন্দিরে পূজা-অর্চনা, মহাভোগ ও আরতি প্রদান করা হয়। জগন্নাথের প্রসাদ কখনো উচ্ছিষ্ট বা অস্পৃশ্য হয় না। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের ছোঁয়া লাগলেও এ প্রসাদ গ্রহণ করা যায়। এখানে মূর্তিদর্শনে ভক্তরা পুণ্যলাভ করেন। মন্দিরটি হিন্দুধর্মের প্রধান চারটি ধামের একটি। ভক্তদের বিশ্বাস, এ ধাম দর্শনে মোক্ষ বা মুক্তি লাভ হয়।

মন্দিরের দেয়ালের গায়ে খোদাই করা রয়েছে সুন্দর সুন্দর ভাস্কর্য। জগন্নাথ মন্দিরের মহাপ্রসাদ সকলকে প্রদান করা হয়। প্রধান মন্দিরের চার দিকে ছোটো-বড়ো আরো ৩০টি মন্দির রয়েছে। জগন্নাথ দেবের মন্দিরে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয় ১২টি পার্বণ। পার্বণগুলোর মধ্যে প্রধান হলো রথযাত্রা। আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এ দিনে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তিকে রথে তুলে সকলে মিলে রথ টানে। এই রথ টানা উৎসবই রথযাত্রা। পুরীর রথযাত্রা জগদ্বিখ্যাত। দেশ-বিদেশের অনেক ভক্ত ও দর্শনার্থী রথযাত্রায় আসেন। আমরাও কোনো এক সময়ে পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দির দেখতে যাব।

মন্দির দর্শনে তোমার অনুভূতি কেমন হয়, তা নিজের ভাষায় প্রকাশ করো:

... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...

তীর্থক্ষেত্র

তীর্থক্ষেত্র হলো পুণ্যস্থান। তীর্থক্ষেত্র দেব-দেবী বা মুনি-ঋষির স্মৃতিবিজড়িত পবিত্র স্থান। ঈশ্বরের কৃপা লাভের জন্য মানুষ তীর্থক্ষেত্রে যায়। তীর্থক্ষেত্রে গেলে মনে ধর্মভাব জাগে। দেহ-মন পবিত্র হয়। পাপ নাশ হয়। পুণ্যলাভ হয়। মনে শান্তি আসে। হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়। যজ্ঞ, দান ও পূজা করলে যে পুণ্যলাভ হয়, তীর্থদর্শনেও সেই পুণ্যলাভ হয়। স্বর্গলাভ হয়। পৃথিবীতে অনেক তীর্থক্ষেত্র আছে। এ সকল তীর্থক্ষেত্র দর্শনে অসংখ্য তীর্থযাত্রী যান। চন্দ্রনাথ, লাঙ্গালবন্দ, গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা, হরিদ্বার, নবদ্বীপ প্রভৃতি হিন্দুদের বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র।

নিচে বর্ণিত দুটি তীর্থক্ষেত্র সম্পর্কে আমরা জানব:

লাঙ্গালবন্দ

লাঙ্গালবন্দ একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। এটি নারায়ণগঞ্জ জেলার ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত। এখানে চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে পুণ্যস্নান অনুষ্ঠিত হয়। তখন অসংখ্য পুণ্যার্থী পুণ্যস্নানের জন্য লাঙ্গালবন্দে আসেন। কিংবদন্তি আছে, লাঙ্গালবন্দের ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করে পরশুরাম পাপমুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর পাপমুক্তির কথা স্মরণ করেই পুণ্যার্থীরা এখানে পুণ্যস্নান করেন। এ স্নানকে অষ্টমীর স্নান বলে। স্নানের সময় পুণ্যার্থীরা ফুল, বেলপাতা, ধান, দূর্বাসহ পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করেন। আগত ভক্তদের পুণ্যস্নান নির্বিঘ্ন করতে এখানে অনেকগুলো ঘাট তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি ঘাটের নান্দনিক নাম আছে। যেমন: অন্নপূর্ণা ঘাট, জয়কালী ঘাট, প্রেমতলা ঘাট, কালীদহ ঘাট, বরদেশ্বরী ঘাট ইত্যাদি। ঘাট ছাড়াও এখানে অনেকগুলো মন্দির ও আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। লাঙ্গালবন্দে ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কাসহ দেশি-বিদেশি পুণ্যার্থীরা পুণ্যস্নানে আসেন।

ভক্তদের বিশ্বাস, ব্রহ্মপুত্র নদের লাঙ্গালবন্দ স্থানে স্নান করলে পুণ্যলাভ হয়। এ স্নানে ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হন। পাপমোচন হয়। পুণ্যার্থীরা এটাও মনে করেন, চৈত্রের অষ্টমী তিথিতে জগতের সকল তীর্থের পুণ্য এখানে মিলিত হয়। তাই ভক্তবৃন্দ এই তিথির পবিত্র জলে স্নানের মাধ্যমে পুণ্যলাভ করেন। এই পুণ্য যা মোক্ষ বা মুক্তি লাভের সহায়ক।

মথুরা

মথুরা হিন্দুদের অন্যতম পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। এটি ভারতের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত। প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে মথুরানগরীতে অবস্থিত কংসের কারাগারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মথুরা শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র। এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলার নিদর্শন আছে। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ থেকে মথুরার প্রসিদ্ধির কথা জানা যায়। এখানে বহু দর্শনীয় স্থান ও মন্দির রয়েছে। স্থানগুলোর মধ্যে দ্বারকাধীশ মন্দির, শ্রীকৃষ্ণ-জন্মভূমি মন্দির, গীতা মন্দির, গোকুলনাথ মন্দির, কংসের দুর্গ উল্লেখযোগ্য। মন্দিরগুলো অনেক সুন্দর। অপূর্ব তার শিল্পকলা। মথুরা দর্শনে ভক্তদের মনে শ্রদ্ধাবোধ জেগে ওঠে। ভক্তরা পূজা-অর্চনা করেন। তাঁরা এখানে তীর্থযাত্রা ও স্নান করে পুণ্যলাভ করেন। ঈশ্বর তুষ্ট হন। ঈশ্বর খুশি হয়ে তীর্থযাত্রীদের আশীর্বাদ করেন। তাঁর আশীর্বাদে ভক্তদের ইহজগৎ ও পরজগতে শান্তি লাভ হয়। মানবের কল্যাণ হয়।

তোমার জানা কয়েকটি তীর্থক্ষেত্রের নাম বলো এবং নিচে লেখ:

১	
২	
৩	
৪	
৫	

তীর্থক্ষেত্র দর্শনের অনুভূতি জানিয়ে তোমার বন্ধুকে একটি চিঠি লেখ:

তারিখ:.....................

স্থান: ....

প্রিয়.......................

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

ইতি তোমার বন্ধু

... ...

সম্প্রীতি ও সহাবস্থান

পূজা-পার্বণ, তীর্থদর্শন ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সম্প্রীতি এবং সহাবস্থানের মনোভাব তৈরি হয়।

শ্রদ্ধা হলো কোনো ব্যক্তির প্রতি সম্মানসূচক ও ইতিবাচক অনুভূতি। শ্রদ্ধা শব্দের আর একটি অর্থ বিশ্বাস। অপরের প্রতি সম্মানসূচক এবং আস্থাজ্ঞাপক আচরণ করা আমাদের সবার কাম্য। আমরা সমাজবদ্ধ জীব। সমাজে বাস করতে হলে পরস্পরকে সম্মান প্রদর্শন করতে হয়। সহনশীলতা প্রকাশ করতে হয়। অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হয়।

আমাদের দেশে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান প্রভৃতি ধর্মের লোক বাস করে। এছাড়া বিভিন্ন উপজাতিও বাস করে; কিন্তু জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে বাংলাদেশি। প্রতিটি ধর্মের নিজস্ব বিধিবিধান আছে। সেগুলো চর্চার পথ এবং পদ্ধতিও আলাদা। জীবন-যাপন পদ্ধতি ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে পার্থক্য থাকলেও সকল মানুষ সমান। মনুষ্যত্ব অর্জনই আমাদের মূল লক্ষ্য। সকল ধর্মের মূল লক্ষ্যও হচ্ছে মানবকল্যাণ এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে।

এদেশে বসবাসকারীদের ধর্মীয় উৎসবগুলোর মধ্যে দুর্গাপূজা, জন্মাষ্টমী, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা, বুদ্ধপূর্ণিমা, বড়দিন উল্লেখযোগ্য। ধর্মনিরপেক্ষ উৎসবও উদ্‌যাপিত হয়। যেমন: নবান্ন, পহেলা বৈশাখ, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস প্রভৃতি। আবার পাহাড়ি অঞ্চলে উপজাতিরা বিজু, বৈসাবি উৎসব উদ্‌যাপন করে। এসব অনুষ্ঠান পালন ও উদ্‌যাপনের সময় একে অপরের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে। সমস্ত মানুষ এক মেলবন্ধনে আবদ্ধ হয়। ফলে পারস্পরিক সম্প্রীতির সৃষ্টি হয়। পরস্পরের প্রতি বাড়ে শ্রদ্ধা। সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হয়। মনে-প্রাণে আমরা হয়ে উঠি বাংলাদেশি। বিকশিত হয় মানবিক গুণ। থাকে না কোনো ধর্মীয় এবং জাতিগত ভেদাভেদ। আবহমানকাল ধরে এদেশে সহনশীলতা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সংস্কৃতির চর্চা চলে আসছে।

প্রতিটি ধর্মের অনুসারীদের নিজ ও অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। হিন্দুধর্মের অনুসারীরা বিশ্বাস করে—'যত মত, তত পথ।' অর্থাৎ ধর্মপালনে বিভিন্ন মত ও পথ আছে; কিন্তু কারো প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন ও অসহিষ্ণু আচরণ করা যাবে না। সকল মত ও পথের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় সম্প্রীতি। সৃষ্টি হয় সর্বজনীন সহনশীলতা। হিন্দুদের বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসহ প্রতিটি ধর্মগ্রন্থেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং সহাবস্থানের অনুশীলনের কথা আছে। এসব ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে অন্য ধর্ম ও মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার শিক্ষা পাওয়া যায়। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্পর্কে জানা যায়। অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করা অন্যতম মানবিক গুণ। তাই আমাদের সকলের মানবিক গুণ অর্জন করতে হবে।

পরমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং সকলের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য তোমাদের কী করণীয় দলগতভাবে আলোচনা করে লেখ:

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

অনুশীলনী

(ক) সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. মন্দিরে গেলে .... হয়।

২. কান্তজী মন্দির দিনাজপুর জেলার .... নদীর তীরে অবস্থিত।

৩. শ্রীকৃষ্ণের অপর নাম ....।

৪. লাঙ্গলবন্দে পুণ্যস্নানের সময় ভক্তরা পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে .... করেন।

৫. মথুরা হলো শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান ও তাঁর .... ক্ষেত্র।

(খ) বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

বাম	ডান
১. মন্দির	লাঙ্গলবন্দে অনুষ্ঠিত হয়।
২. কান্তজী মন্দির	জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই গ্রহণ করতে পারে।
৩. মহাপ্রসাদ	দিনাজপুর জেলার একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন।
৪. অষ্টমীর স্নান	একটি আধ্যাত্মিক সাধনার স্থান।
৫. মথুরা হিন্দুদের অন্যতম	পুণ্যলাভের স্থান।
	পবিত্র তীর্থক্ষেত্র।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

(গ) সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. 'দেবালয়' শব্দটি দিয়ে বোঝানো হয়?

ক) বিদ্যালয় খ) মন্দির
গ) আবাসস্থল ঘ) রাজপ্রাসাদ

২. কান্তজী মন্দির কোথায় অবস্থিত?

ক) পুরী খ) নারায়ণগঞ্জ
গ) দিনাজপুর ঘ) যশোর

৩. কান্তজী মন্দিরের নির্মাণ কাজ কে শুরু করেন?

ক) রাজা রামনাথ রায় খ) মহারাজ প্রাণনাথ রায়
গ) মহারাজ গিরিজানাথ ঘ) রাজা কৃষ্ণচন্দ্র

৪. লাঙ্গালবন্দ কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

ক) পদ্মা খ) যমুনা
গ) ব্রহ্মপুত্র ঘ) গঙ্গা

৫. তীর্থ ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য হলো—

ক) আনন্দ লাভ খ) দেবতা দর্শন
গ) পুণ্য অর্জন ঘ) অনুষ্ঠান পালন

(ঘ) নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. কান্তজী মন্দিরের গায়ে কী রয়েছে?
২. পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে কোন কোন দেবতার পূজা হয়?
৩. লাঙ্গালবন্দ কোথায় এবং এটি কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
৪. তীর্থক্ষেত্র মথুরায় কী কী দেখতে পাওয়া যায়?
৫. সম্প্রীতি ও সহাবস্থান কী?

ঙ) নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর দাও:

১. মন্দির ও তীর্থক্ষেত্রের চারটি করে বৈশিষ্ট্য লেখ।
২. পুরীর জগন্নাথ মন্দির সম্পর্কে তোমার ধারণা দশটি বাক্যে লেখ।
৩. 'লাঙ্গালবন্দ একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র'—ব্যাখ্যা করো।
৪. মথুরা হিন্দুদের কাছে কেন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ? পাঁচটি বাক্যে লেখ।
৫. তীর্থস্থানগুলো ভক্তদের জীবনে কীভাবে প্রভাব ফেলে? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো।

পঞ্চম অধ্যায়

জীবসেবা ও দেশপ্রেম

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানুষ, প্রকৃতি ও ঈশ্বর

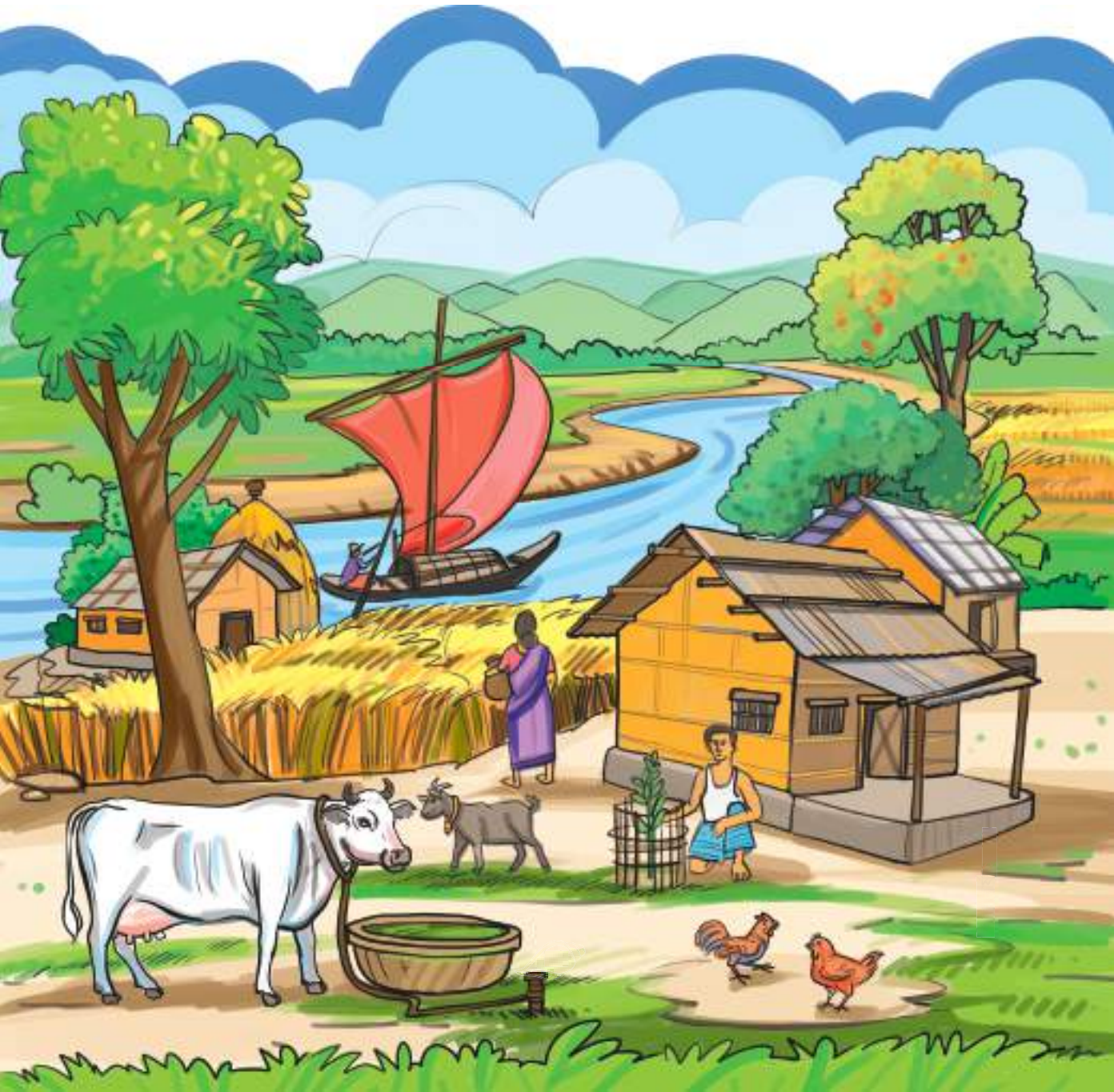

ছবিতে প্রকৃতি ও পরিবেশের যেসব উপাদান দেখা যাচ্ছে তার একটি তালিকা তৈরি করো এবং বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে এগুলোর সাথে মানুষের সম্পর্ক লেখ:

উদাহরণস্বরূপ একটি দেখানো হলো।

ছবির উপাদান	মানুষের সাথে এর সম্পর্ক
গাছপালা	মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের উৎস

মানুষ প্রকৃতির সন্তান। প্রকৃতির কোলেই মানুষ বাঁচে-বাড়ে। প্রকৃতি ও জীব-জগতের প্রতিটি উপাদানই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ জীবন ধারণের জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতিই তার অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের সহায়। আবার প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। ঈশ্বর প্রকৃতি ও মানুষসহ সবকিছুর স্রষ্টা। ঈশ্বর তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির সাথে মিশে আছেন। প্রতিটি জীবে ঈশ্বর আত্মারূপে বিরাজমান। আমরা ঈশ্বরকে দেখতে পাই না কিন্তু তাঁকে উপলব্ধি করতে পারি। প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যেই ঈশ্বর প্রকাশিত। ভক্তিযুক্ত মনে ঈশ্বরের সৃষ্টির দিকে দৃষ্টিপাত করলে তাঁর অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়। ভক্তের হৃদয়ে স্রষ্টার প্রতিটি সৃষ্টিই অপার সৌন্দর্য নিয়ে ধরা দেয়। সংবেদনশীল মানুষ সকল সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরের স্বরূপ দর্শন করে আনন্দ লাভ করেন। আর তখনই ঈশ্বরের প্রতি এবং সকল সৃষ্টির প্রতি মানুষের ভক্তিভাবের প্রকাশ ঘটে।

হিন্দুদের ভাবনায় প্রকৃতি ও মানুষ একীভূত হয়ে গেছে। বৃক্ষ, লতা-পাতা, জীব-জন্তু সবই আপন। প্রকৃতির প্রতিটি চৈতন্যময় সত্তায় আছে দেবতা। তাই হিন্দুর দেবতা অনেক উপরে

আসীন, দণ্ডধারী কেউ নয়। হিন্দুর দেবতা আছে সূর্যের আলোয় আলোয়। আছে চাঁদের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায়। আছে নদী-সাগরের তরঙ্গে তরঙ্গে। ঘাসে ঘাসে শিশিরের প্রতিটি বিন্দুতে। দেবতা আছে প্রতিটি ধূলিকণায়। এজন্য প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানের প্রতি যত্নশীল হওয়া আমাদের কর্তব্য। প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি সংবেদনশীল আচরণ করা মানুষের নৈতিক গুণের প্রকাশ।

হিন্দুধর্মীয় সংস্কৃতিতে প্রকৃতির প্রতিটি চৈতন্যময় সত্তাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করা হয়। এর মধ্যে প্রকৃতি সংরক্ষণের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। শুধু তা-ই নয়, পূজার উপচারেও রয়েছে প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতিটি উপাদানের সাথে নিবিড় সংযোগ। এসব ধর্মীয় রীতির কারণেও হিন্দুরা প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি যত্নশীল। ধর্মগ্রন্থসমূহে এ বিষয়ে বিভিন্ন কাহিনি আছে। তেমনি একটি কাহিনি তোমাদের জন্য এখানে তুলে ধরা হলো।

মহাভারতের অনুশাসনপর্বে শুক ও ইন্দ্রকে নিয়ে একটি চমৎকার কাহিনি আছে। কাশিরাজ্যে এক বিশাল অরণ্য ছিল। সেই অরণ্যে ছিল এক বিশাল বৃক্ষ। সেই বৃক্ষের শাখায় এক শুকপাখি বাস করত। একদিন এক ব্যাধ পাখিটিকে তীরবিদ্ধ করতে গেলে ভাগ্যক্রমে পাখিটি বেঁচে যায়। কিন্তু সেই বিষাক্ত তীরটি বৃক্ষে বিদ্ধ হয়। বিষের ক্রিয়ায় ক্রমশ বৃক্ষটি শুকিয়ে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে। এর ফলে শুকও খাদ্যাভাবে দিন দিন মরণাপন্ন হয়ে পড়ে; কিন্তু কিছুতেই শুক সেই বৃক্ষকে ছেড়ে যায় না। দেবরাজ ইন্দ্র বিষয়টি লক্ষ করে একদিন সেখানে উপস্থিত হন। তিনি শুককে জিজ্ঞাসা করেন, 'কেন তুমি এ মৃতপ্রায় বৃক্ষকে ত্যাগ করে নতুন কোনো বৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করছ না?' উত্তরে শুক বলে, 'আমি এতদিন এই বৃক্ষকে আশ্রয় করে বেঁচে আছি, আর আজ এর বিপদের দিনে একে ত্যাগ করব? এ আমি কিছুতেই করতে পারব না।' শুকের এই বৃক্ষপ্রেম দেখে ইন্দ্র মুগ্ধ হন এবং দৈববলে বৃক্ষটিকে পুনরায় সজীব করে তোলেন।

মানুষ, প্রকৃতি ও ঈশ্বর সম্পর্কে সহপাঠীদের সাথে কথা বলে তাদের মতামত জানার চেষ্টা করো এবং নোট রাখো:

ঈশ্বর	
প্রকৃতি	
মানুষ	

প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে আমরা কী কী কাজ করতে পারি? সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে দলগতভাবে এ বিষয়ে একটি পোস্টার তৈরি করো।

পোস্টারের নমুনা

শিরোনাম: প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে আমাদের করণীয়

দলের নাম: ... ...

দলনেতা ও সদস্যদের নাম: ... ...

প্রকৃতির উপাদান	সংরক্ষণে আমাদের করণীয়
বনভূমি	
নদী	
অন্যান্য প্রাণী	

অনুশীলনী

(ক) সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. মানুষ ---------- সন্তান।
২. প্রতিটি জীবে ঈশ্বর ---------- বিরাজমান।
৩. প্রকৃতির প্রতিটি চৈতন্যময় সত্তায় আছে ----------।
৪. প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানের প্রতি ---------- হওয়া আমাদের কর্তব্য।

(খ) বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

বাম	ডান
১. প্রকৃতির কোলেই মানুষ	দণ্ডধারী কেউ নয়।
২. মানুষ জীবন ধারণের জন্য	একীভূত হয়ে গেছে।
৩. হিন্দুদের ভাবনায় প্রকৃতি ও মানুষ	বাঁচে-বাড়ে।
৪. হিন্দুর দেবতা অনেক উপরে আসীন,	প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল।
	আলাদা হয়ে গেছে।

(গ) সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি সংবেদনশীল আচরণ করা মানুষের কোন গুণের প্রকাশ?

ক) নৈতিক গুণ　　খ) আধ্যাত্মিক গুণ
গ) সাংস্কৃতিক গুণ　　ঘ) ঐশ্বরিক গুণ

২. স্রষ্টার প্রতিটি সৃষ্টিই অপার সৌন্দর্য নিয়ে ধরা দেয় কোথায়?

ক) পাতালপুরীতে　　খ) স্বর্গরাজ্যে
গ) মন্দির ও তীর্থক্ষেত্রে　　ঘ) ভক্তের হৃদয়ে

৩. হিন্দুধর্মীয় সংস্কৃতিতে প্রকৃতির প্রতিটি চৈতন্যময় সত্তাকে কী জ্ঞানে পূজা করা হয়?

ক) স্রষ্টাজ্ঞানে　　খ) সৃষ্টিজ্ঞানে
গ) দেবতাজ্ঞানে　　ঘ) জীবজ্ঞানে

৪. শুক পাখির বৃক্ষপ্রেম দেখে কে মুগ্ধ হন?

ক) ইন্দ্র　　খ) বরুণ
গ) অগ্নি　　ঘ) বিষ্ণু

(ঘ) নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. কেন হিন্দুরা প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণে অধিক যত্নশীল?
২. সকল সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারেন কারা?
৩. আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টিকে কেন ভালোবাসব?

ঙ) নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর দাও:

১. 'পাখির বৃক্ষপ্রেম' কাহিনিটি আমাদের কী শিক্ষা দেয়? পাঁচটি বাক্যে লেখ।
২. মানুষ জীবন ধারণের জন্য কীভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল? উদাহরণসহ লেখ।
৩. পরিবেশ সংরক্ষণের পাঁচটি উপায় লেখ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জীবসেবা

জীবসেবা হলো মানুষসহ সকল জীবের প্রতি সহমর্মী হয়ে তাদের কল্যাণের জন্য কাজ করা। সহমর্মিতা মানুষের অন্যতম নৈতিক গুণ। ছবিতে জীবের প্রতি মানুষের সহমর্মিতার যে উদাহরণ দেখা যাচ্ছে, তা নিয়ে একটি অনুচ্ছেদ লেখ:

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

শ্রীমদ্ভাগবত থেকে শ্রীকৃষ্ণের জীবসেবার একটি কাহিনি উল্লেখ করা হলো। এখানে তোমরা বালক শ্রীকৃষ্ণের জীবের প্রতি দয়ার চমৎকার এক নিদর্শন খুঁজে পাবে।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকাল ছিল অনেক মধুর চপলতায় ভরা। মা যশোদা এমনকি প্রতিবেশীরাও বালক শ্রীকৃষ্ণের দুরন্তপনায় অতিষ্ঠ ছিলেন। মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের দুরন্তপনাকে বাৎসল্য স্নেহে

প্রশ্রয় দিতেন। আবার কখনো শাসন করতেন। সকল জীবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অপরিসীম ভালোবাসা ও দয়া ছিল। প্রতিবেশী শিশুদের মতো আশেপাশের বন্য প্রাণীরাও ছিল শ্রীকৃষ্ণের খেলার সাথি। প্রায়ই বালক শ্রীকৃষ্ণ ঘরের খাবার নিয়ে তার খেলার সাথি ও পশু-পাখিদের সাথে ভাগাভাগি করে খেতেন। একবার মা যশোদা ননী তৈরি করে ঘরে তুলে রেখেছেন। শ্রীকৃষ্ণের নজরে এলো একদল বানর সেই ননীর লোভে ঘরের পাশে ঘোরাঘুরি করছে। শ্রীকৃষ্ণের খুব দয়া হলো। তিনি ঘর থেকে ননী এনে বানরদের খেতে দিলেন। এ দৃশ্য দেখে মা যশোদা রাগ করলেন; কিন্তু পরক্ষণেই ছেলের জীবসেবায় সন্তুষ্ট হয়ে তাকে আদর করে কোলে তুলে নিলেন। বালক শ্রীকৃষ্ণের জীবসেবার এমন বহু দৃষ্টান্ত আজও ভক্তদের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণের জীবসেবার গল্পের মতো আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করো:

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

শীতের সকাল। অমল স্কুলের পথে পা বাড়িয়েছে। এমন সময় তার চোখে পড়ল একটি বিড়ালছানা। পথের পাশে গর্তে পড়ে বিড়ালছানাটি করুণ স্বরে মিউ মিউ করে কাঁদছে; কিন্তু তাকে উদ্ধার করতে কেউ এগিয়ে আসছে না। বিড়ালের কান্নার শব্দ শুনে অমলের মন খুব খারাপ হলো। সে দ্রুত বিড়ালছানাটির কাছে এগিয়ে গেল। কাছে গিয়ে দেখল বিড়ালছানাটি জল-কাদার মধ্যে পড়ে আছে। ঠাণ্ডায় তার মরণাপন্ন অবস্থা । অমল তখনই স্কুলব্যাগ নামিয়ে রেখে বিড়ালছানাটিকে টেনে তুলল। তারপর ছানাটির গা মুছিয়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। অমলের মা ছেলেকে ফিরে আসতে দেখে অবাক হলেন। তারপর কাছে এগিয়ে আসতেই ছেলের হাতে বিড়ালছানা দেখে কিছুটা বিরক্ত হলেন; কিন্তু ছেলের কাছে পুরো ঘটনা শুনে তিনি খুশি হলেন। বিড়ালছানাটিকে গরম কাপড়ে জড়িয়ে রেখে অমলকে স্কুলে যেতে বললেন। অমল মায়ের হাতে বিড়ালছানাকে রেখে স্কুলে গেল। দেরিতে স্কুলে পৌঁছানোর জন্য শ্রেণি-শিক্ষকও কারণ জানতে চাইলেন। অমলের জীবসেবার কথা শুনে শিক্ষক এবং শ্রেণির সকল শিশু তাকে বাহবা দিতে লাগল।

বর্ণিত ঘটনা থেকে অমলের নৈতিক গুণের পরিচয় তুলে ধরো। এমন পরিস্থিতিতে তুমি হলে কী করতে?

তোমরা কি পুতুল খেলো? নিচের ঘটনাটি পড়ে দেখো।

অপর্ণা পুতুল নিয়ে খেলতে ভালোবাসে। সে নিজেও মাটি, কাগজ, কাপড় দিয়ে পুতুল বানায়। অপর্ণার অনেক পুতুল আছে; কিন্তু নিজের তৈরি পুতুলগুলোই তার অধিক প্রিয়। কেউ যখন তার তৈরি পুতুলগুলোকে আদর করে, তখন অপর্ণার খুব আনন্দ হয়। পুতুলগুলোর প্রতি তার যত্নের শেষ নেই। প্রতিটি মানুষই আসলে তার সৃষ্টিকে খুব ভালোবাসে।

ঈশ্বরও তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকে ভালোবাসেন। ঈশ্বর সবকিছুর স্রষ্টা। ঈশ্বর তার সকল সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশিত। সকল জীবের মধ্যে ঈশ্বর আত্মারূপে বিরাজিত। সেজন্য ঈশ্বরের সৃষ্টিকে ভালোবাসলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন। সৃষ্টিকে ভালোবাসলে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পায়। এভাবে মানুষ সহজেই ঈশ্বরকে ভালোবাসার পথ বেছে নিতে পারে।

জীবসেবাই ঈশ্বরসেবা। মা যেমন তার সন্তানের প্রতি ভালোবাসায় খুশি হন, তেমনি ঈশ্বরও তাঁর সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসায় প্রসন্ন হন। সকল সৃষ্টি ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন। মানুষের মধ্যে যে মহৎ গুণাবলির সমাবেশ তাও ঈশ্বরের প্রকাশ। যিনি জীবের প্রতি সদয়, ঈশ্বরও তার প্রতি সদয় হন।

অনুশীলনী

(ক) সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকাল ছিল অনেক মধুর ---------- ভরা।
২. ঈশ্বর তাঁর প্রত্যেক সৃষ্টিকে ---------- ।
৩. সৃষ্টিকে ভালোবাসলে ---------- প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পায়।
৪. যিনি ---------- প্রতি সদয় ঈশ্বরও তার প্রতি সদয় হন।

(খ) বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

বাম	ডান
১. মানুষ নিজের সৃষ্টিকে	স্রষ্টা।
২. ঈশ্বর সবকিছুর	ঈশ্বরসেবা।
৩. ঈশ্বরের সৃষ্টিকে ভালোবাসলে	খুব ভালোবাসে।
৪. জীবসেবাই	যত্ন পরিচর্যা।
	ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন।

(গ) সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. বালক শ্রীকৃষ্ণ বানরদের কী খেতে দিয়েছিলেন?
ক) ননী খ) ঘি
গ) জল ঘ) দুধ

২. অমল স্কুলে যাবার পথে কী দেখে থেমে গিয়েছিল?
ক) ছাগলছানা খ) বিড়ালছানা
গ) কুকুরছানা ঘ) পাখিরছানা

৩. সকল জীবের মধ্যে ঈশ্বর কী রূপে বিরাজিত?
ক) মন রূপে খ) চিন্তা রূপে
গ) আত্মা রূপে ঘ) দেহ রূপে

৪. সকল সৃষ্টি কার ইচ্ছাধীন?
ক. ঈশ্বরের খ. মানুষের
গ. দেবতাদের ঘ. অসুরদের

(ঘ) নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. জীবকে সেবা করলে কী হয়?
২. অমল কেন বিড়ালছানাটিকে কোলে তুলে নিয়েছিল?
৩. যে কোনো অসহায় জীবের জন্য তোমার একটি কর্তব্য লেখ।

ঙ) নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর দাও:

১. তোমরা অমলের জীবসেবার কাহিনিটি পড়েছ, অমলের জায়গায় তুমি হলে কী করতে?
২. 'জীবসেবাই ঈশ্বরসেবা'—পাঁচটি বাক্যে ব্যাখ্যা করো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দেশপ্রেম

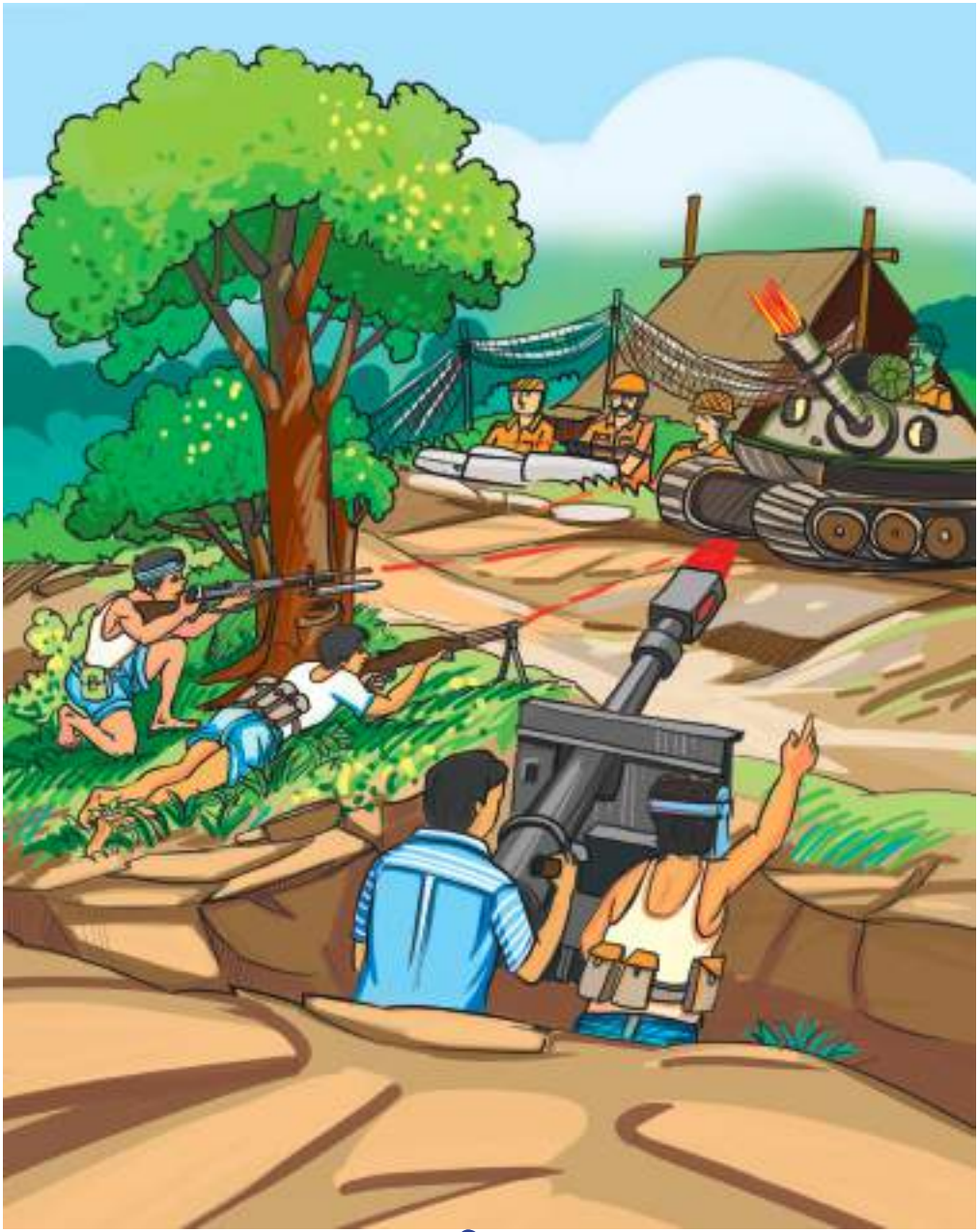

মুক্তিযুদ্ধ

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কথা তোমরা জানো। মাতৃভূমির জন্য আত্মবলিদান করা অসংখ্য বীর মুক্তিযোদ্ধার গল্প তোমরা শুনেছ। স্বদেশের মুক্তির সংগ্রামে মানুষ কেন নিজের জীবন বাজি রেখে লড়াই করেছিল? এ বিষয়ে দলগত আলোচনার মাধ্যমে তোমাদের ধারণা লেখ:

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

দেশপ্রেম সম্পর্কে রামায়ণে আছে—'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।' অর্থাৎ জননী জন্মভূমি স্বর্গের থেকেও শ্রেষ্ঠ। মানুষ প্রকৃতির কোলে জন্মগ্রহণ করে। প্রকৃতির কোলেই জীবনধারণ করে। আর এই প্রকৃতি হলো তার জন্মভূমি। সেজন্যই জন্মভূমিকে জননী সম্বোধন করা হয়েছে। জন্মভূমির প্রতি মানুষের ভালোবাসা তাই সুগভীর। জন্মভূমি তথা স্বদেশের যে কোনো প্রয়োজনে মানুষ জীবন উৎসর্গ করতেও দ্বিধাবোধ করে না। স্বদেশের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারার যে আনন্দ তা দেশপ্রেমী মাত্রই উপলব্ধি করতে পারেন। হিন্দুশাস্ত্রে দেশপ্রেমকে ধর্মের অঙ্গ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দেশ ও মানুষের কল্যাণার্থে পূজা-অর্চনা করার কথা বলা হয়েছে। সমবেত প্রার্থনায় বারবার দেশপ্রেমের জয়গান ধ্বনিত হয়েছে। দেশপ্রেম মানুষের অন্যতম নৈতিক গুণ। শুধু দেশের জন্য যুদ্ধ করাই দেশপ্রেম তা কিন্তু নয়, নিজের চারপাশের পরিবেশের যত্ন করাও দেশপ্রেম, আমরা যে জায়গায় বসবাস করি, তার চারপাশ সংরক্ষণ করাও আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণে আমাদের যত্নবান হতে হবে।

প্রবীরের দেশপ্রেম

অনেক কাল আগের কথা। মাহিষ্মতিপুরের রাজা ছিলেন নীলধ্বজ। রানি ছিলেন জনা এবং রাজপুত্র প্রবীর। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধজয়ের পর পাণ্ডব যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরের রাজা হন। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞের ঘোড়ার নেতৃত্ব দেন অর্জুন। চতুর্দিক জয় করতে করতে অর্জুনের ঘোড়া মাহিষ্মতিপুর রাজ্যে এসে পৌঁছায়। তখন পরাক্রমশালী অর্জুনের সামনে কেউ দাঁড়াতে সাহস পায় না। সকলেই অর্জুনের বশ্যতা স্বীকার করে নেন। বিষয়টি রাজপুত্র প্রবীরকে আহত করে। তিনি মাতৃভূমির এ পরাজয় কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। প্রবীরের দেশপ্রেমের কাছে অর্জুনের পরাক্রম তুচ্ছ মনে হয়। মায়ের অনুপ্রেরণায় প্রবীর অর্জুনের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়াকে বন্দি করেন। তখন অর্জুনের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে প্রবীর শরবিদ্ধ এবং বন্দি হন। মাতৃভূমি রক্ষার জন্য প্রবীরের এই বীরত্ব রাজা নীলধ্বজকে মোহিত করে। তারপর রাজা নীলধ্বজ প্রবীরকে উদ্ধারের জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। সেই যুদ্ধে প্রবীরের মৃত্যু হয়। মাতৃভূমির জন্য প্রবীরের বীরত্বগাথা ও প্রাণদান আজও দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। প্রবীর মরে গিয়েও অমর হয়ে আছেন।

দেশপ্রেম থেকে বিশ্বপ্রেম

দেশপ্রেম মানুষের জন্মগত প্রবণতা। কেননা জন্মভূমি মায়ের মতো। জন্মভূমির প্রতি নিবেদিত প্রাণ মানুষ নিজ দেশের প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণে যত্নশীল। দেশ ও মানুষের প্রয়োজনে তাঁরা নিজেকে উৎসর্গ করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। আর দেশ তো পৃথিবীর অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং দেশসেবার মাধ্যমে পৃথিবীকেই সেবা করা হয়। জন্মভূমি আমাদের স্বদেশ। পৃথিবীর মানচিত্রে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড; কিন্তু পৃথিবীর অখণ্ড আকাশ, বাতাস, জল, হাওয়ায় জীবন বিকাশের যে আয়োজন তা অভিন্ন। সুতরাং জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসাই পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা। নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা অনেক সৎকর্ম করি। এই সৎকর্ম পৃথিবী ও সমগ্র বিশ্বচরাচরের কল্যাণে নিবেদিত। এভাবেই দেশপ্রেম বিশ্বপ্রেমে উন্নীত হয়। হিন্দুশাস্ত্রে পৃথিবীর সকল প্রাণীর মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করা হয়েছে:

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্ ভবেৎ।।

অর্থাৎ, জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক। সকলে নিরাময় হোক। সকলে মঙ্গল লাভ করুক। কেউ যেন দুঃখভোগ না করে।

তোমাদের নিজ এলাকার পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নিয়ে তোমরা কাজ করতে চাও? সে বিষয়টি নিয়ে শ্রেণিতে উপস্থাপনের জন্য একটি দলগত প্রকল্প পরিকল্পনা (প্রজেক্ট প্ল্যান) তৈরি করো।

কর্মপরিকল্পনার নমুনা

প্রকল্পের নাম: বিদ্যালয় অঙ্গনে বৃক্ষরোপণ/ জলের অপচয় রোধে সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম

প্রকল্প এলাকা: নিজ বিদ্যালয়/ নিজেদের পাড়া/মহল্লা

বাস্তবায়নকারী দলের নাম:

দলনেতা ও সদস্যদের নাম:

প্রস্তাবিত কাজ (নমুনা)	প্রয়োজনীয় উপকরণ/ সম্পদ	বাস্তবায়ন কাল	দায়িত্ব বণ্টন	প্রত্যাশিত ফলাফল	মন্তব্য
বিদ্যালয় অঙ্গনে ১০টি ফলদ বৃক্ষের চারা রোপণ					
সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রমের মাধ্যমে জলের অপচয় কমানো					

অনুশীলনী

(ক) সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. হিন্দুশাস্ত্রে দেশপ্রেমকে ---------- অঙ্গ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
২. মাহিষ্মতিপুরের রাজা ছিলেন ----------।
৩. দেশপ্রেম মানুষের ---------- প্রবণতা।
৪. জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসাই ---------- প্রতি ভালোবাসা।

(খ) বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

বাম	ডান
১. জন্মভূমিকে জননী	রাজা হন।
২. দেশপ্রেম মানুষের অন্যতম	সেবা করা হয়।
৩. যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরের	প্রার্থনা করা হয়।
৪. দেশসেবার মাধ্যমে পৃথিবীকেই	নৈতিক গুণ।
	সম্বোধন করা হয়েছে।

(গ) সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. জননী-জন্মভূমি স্বর্গের থেকেও শ্রেষ্ঠ—কোন গ্রন্থে বলা হয়েছে?

ক) মহাভারতে
খ) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়
খ) রামায়ণে
ঘ) বেদে

২. অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়াকে কে বন্দি করেন?

ক) প্রবীর
খ) নীলধ্বজ
গ) জনা
ঘ) অর্জুন

৩. কার সঙ্গে প্রবীরের যুদ্ধ হয়?

ক) যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে
খ) অর্জুনের সঙ্গে
গ) নীলধ্বজের সঙ্গে
ঘ) জনার সঙ্গে

৪. কে দেশের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না?

ক) স্বার্থপর
খ) দেশপ্রেমিক
গ) যোদ্ধা
ঘ) রাজা

(ঘ) নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. দেশপ্রেম সম্পর্কে রামায়ণে কী বলা হয়েছে?
২. প্রবীর কেন অর্জুনের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন?
৩. তুমি কীভাবে দেশপ্রেম প্রকাশ করবে? একটি উপায় লেখ।

ঙ) নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর দাও:

১. 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।'—ব্যাখ্যা করো।
২. দেশপ্রেম কীভাবে বিশ্বপ্রেমে উন্নীত হয়? বুঝিয়ে লেখ।

সমাপ্ত

২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য, পঞ্চম শ্রেণি–হিন্দুধর্ম শিক্ষা

সত্যই ধর্ম।
ধর্মকে যে আশ্রয় করে,
ধর্মই তাকে রক্ষা করে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য